ব্লাডসাকার বিট্‌ল্‌

চিরঞ্জীব সেন

প্রাপ্তিস্থান ঃ মৌসুমী প্রকাশনী ।। কলকাতা-৯

প্রকাশকাল :
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৮

প্রকাশক :
দেবদাস বিশ্বাস
দেবদাস প্রকাশন
১এ, কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২।এ, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

পৃথিবীর হাওয়া পালটে যাচ্ছে। চারদিকে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। ফ্যাশন পালটাচ্ছে, জেট প্লেনের স্পিড বাড়ছে, ফ্ল্যাট বাড়ির ডিজাইন পালটাচ্ছে, মানুষ খাদ্যাভ্যাস পালটাচ্ছে, অভিনয়ের রীতি পালটাচ্ছে, গানের সুর পালটাচ্ছে, খুন জখম ডাকাতির টেকনিক পালটাচ্ছে।

এ সব আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন। লক্ষ্য না করে উপায় নেই কারণ আপনি এই সবের অংশীদার।

একশ বছর আগে গরু যেমন দুধ দিত আজও কি সে সেইরকম দুধ দিচ্ছে? পঞ্চাশ বছর আগে ভারতে অনেক চিতা (লেপার্ড নয়) ছিল আজ একটাও দেখা যায় না। এই কলকাতা শহরেই শীতের সময় ময়দানের গাছে গাছে অনেক বিদেশী পাখি আসত। আজ তারা আসে না। বর্ষায় কলকাতার গঙ্গা ইলিশ মাছে ভরে যেত। আজকাল ডায়মণ্ড-হারবারেই ইলিশ মাছ দেখা যায় না।

কেন গরু সেরকম দুধ দেয় না, চিতা বাঘ কোথায় গেল, নেই কেন সেই পাখি, ইলিশরা আর আসে না কেন?

ষাট সত্তর বৎসর আগে অ্যামেরিকার চাষারা স্থির করল চারশ বর্গ মাইল জুড়ে গমের চাষ করবে। সোনা ফলিয়ে দেবে। যে জমি টুকরো টুকরো ভাগ করা ছিল সে জমির ভাগ ভেঙে জমি সমভূমি করা হল নচেৎ ট্র্যাক্টর, টিলার, রিপার ইত্যাদি নব-আবিষ্কৃত কৃষিযন্ত্র চালানো অসুবিধা।

ট্র্যাক্টর গভীর করে মাটি খুঁড়ল। তারপর নব-আবিষ্কৃত রাসায়নিক সার ফেলা হল, জমির মাটি পরীক্ষা না করে এবং সেই বিশেষ সারের দরকার আছে কি না যাচাই না করে। তারপর একদিন ভাল জাতের গমের চারা রোপণ করা হল।

গাছ বড় হল। গাছের ডগায় ফুল এল আর সেই সঙ্গে এল এক সর্বনাশী পোকা। তারা ফুল খেতে আরম্ভ করল। সোনার ফসল পোকার গর্ভে যাবে নাকি? হতেই পারে না। প্লেন থেকে সেই বিশাল ক্ষেতের ওপর বিষাক্ত কীটনাশক ছিটিয়ে দেওয়া হল। এক দিনেই সব পোকা মরল আর সেই সঙ্গে মরল শস্যের পক্ষে উপকারী অনেক পোকা। রাসায়নিক

সার প্রয়োগ করার ফলে মাটির নিচে যে সব পোকা বা কেঁচো জমিকে সরস রাখে, নাইট্রোজেন উৎপাদন করে সে সব তো মরে শেষ হয়ে গেছে। তিন চার বছর বেশ ভাল ফসল হল। তারপর শূন্য। ট্র্যাক্টর চালিয়ে গভীর করে খোঁড়া হয়েছে, সেই জমির ওপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে উর্বরা মাটি ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। জমি এখন বন্ধ্যা। সে জমিতে আর চাষ হয় না, সে জমির নাম দেওয়া হয়েছে "ডাস্ট বোল"।

কারণ কি? মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত গ্যাসে ভরে যাচ্ছে, নদীর জল বিষাক্ত হচ্ছে যার জন্যে কলকারখানা দায়ী, গাছপালা, নির্বিচারে কেটে ফেলায় আবহাওয়াও বদলে যাচ্ছে।

নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে কীট সম্প্রদায় প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলছে এমন কি নতুন জাতের কীট সৃষ্ট হয়ে মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে।

কতদূর বিপন্ন করেছে। তাই জানাতেই এই কাহিনী।

বিনীত

প্রকাশক

কে জানত ওয়ার্ল্ড একোলজি ইয়ার শেষ হতে না হতেই এমন সাংঘাতিক একটা কাণ্ড অকস্মাৎ পৃথিবীর এক অংশে এমন তোলপাড় ঘটাবে। কোথায় কখন কোনদিক থেকে যে অতর্কিতে আক্রমণ আসবে তা অ্যামেরিকা ও ইংলণ্ডের মতো উন্নত দেশও বুঝতে পারে না।

এ যেন হিরোসিমার ওপর অকস্মাৎ অ্যাটম বোমা পড়ে সব ছারখার করে দিল।

দুর্দমনীয় কাণ্ডটা কি ঘটেছিল সেই কাহিনীই বলব। এমন একটা কাণ্ড যে সত্য সত্যই ঘটতে পারে তা মানুষ বুঝি চিন্তা করতে পারে না। কাণ্ডটা যে কতদূর সাংঘাতিক তা এই কাহিনী পড়লেই জানা যাবে।

এই কাহিনী অ্যামেরিকা ও ইংলণ্ডে সত্যসত্যই ঘটেছিল কিন্তু পাছে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মানুষ অহেতুক ভয় পায় এজন্যে খবর আজও সরকারী ভাবে প্রকাশ পায়নি।

কিন্তু ইংলণ্ড ও অ্যামেরিকার সংবাদপত্রের প্রচুর স্বাধীনতা এবং ঐ দুটি দেশে বাঘা বাঘা রিপোর্টারও আছে। তারা খবরটি ফাঁস করে দেয়। তবে খবর ছাপা হয়েছিল অ্যামেরিকার একটি মাত্র খবরের কাগজে যে কাগজের প্রচার সংখ্যা আকাশ-ছোঁয়া নয় বা দেশের বাইরেও যায় না।

পরপর মোট আটটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে ঐ সাংঘাতিক কাণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। কাগজটির নাম ডেনভার ইনকুয়ারার। সেই কাগজ থেকে খবর সংগ্রহ করে আমরা পাঠক পাঠিকাদের কাছে পেশ করছি।

পৃথিবীতে প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করার যে বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞানকে বলা হয় একোলজি।

ওয়ার্ল্ড একোলজি ইয়ার-এর সূত্রপাত করা হল সেবার ইটালির রাজধানী প্রাচীন রোম নগরে। পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে সে বছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে বিজ্ঞানীরা সমবেত হয়েছেন। এদের মধ্যে কেউ এণ্টমোলজিস্ট, কেউ বায়োলজিস্ট। সে বিরাট ব্যাপার।

বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এসেছে সাংবাদিক, বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ী ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো হোটেলে তিল ধারণের স্থান নেই।

পৃথিবীর উন্নত, উন্নতিশীল বা উন্নতিকামী দেশের সকল বিজ্ঞানী এমন কি কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজসেবী একমত হলেন যে মানুষ তো দূরের কথা এমন কি জীবজন্তু, পাখি ও পোকামাকড়দের পক্ষেও পৃথিবীতে বাস করা অত দ্রুত বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পশু পাখি তো নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছেই, কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগে ভাল মন্দ সব পোকামাকড়ই ধ্বংস করা হচ্ছে এবং শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ এতদূর দূষিত হচ্ছে যে মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে বাস করা অসম্ভব হচ্ছে।

আরও এক বিপদ দেখা দিয়েছে। ক্যালিফোরনিয়ার উত্তরে যে গভীর অরণ্য আছে সেই অরণ্যে নাকি এমন কিছু কীট সৃষ্টি হয়েছে যা একটা বড় গাছের সমস্ত পাতা সাত দিনে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে, একটা মৃত ঘোড়া নাকি তিন দিনে শেষ করে ফেলেছে। সাংঘাতিক ব্যাপার।

সেখানে বিজ্ঞানীর দল ছুটে গেছে কিন্তু সেই কীটবংশকে এখনও আয়ত্তে আনতে পারে নি। ঐ অঞ্চলের মানুষ ভীষণ ভয় পেয়েছে। এই ধরনের বিপদের মোকাবিলা করতে হবে।

রোমের বিরাট সম্মিলনীতে অনেক প্রস্তাব গৃহীত হল। সম্মেলন

একদিন শেষও হল। এবার বিজ্ঞানীরা এবং আরও যারা রোমে এসেছিল তারা এবার একে একে দেশে ফিরছে।

ভারত থেকেও দুজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রোমের ঐ কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। একজন হলেন ডঃ সদাশিব মুবানজন। তিনি ঐ কনফারেন্সে কেরলের সাইলেণ্ট ভ্যালি সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট পাঠ করেছিলেন এবং এই গভীর অরণ্য যে নষ্ট করা উচিত নয় সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

আর একজন গিয়েছিলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আল্লামা কুরেশি। হিমালয়ের যে সব প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে তিনি একটি নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

কনফারেন্স শেষ হবার একদিন আগে ডঃ মুরানজন চলে যান নাইরোবি এবং ডঃ কুরেশি আর একটি কনফারেন্সে ভাষণ দিতে যান ফিলাডেলফিয়া।

কনফারেন্সে স্থির হয়েছিল যে বিজ্ঞানীরা নিজের দেশে ত বটেই এমন কি সুযোগ পেলে অন্য দেশে যেয়েও অবলুপ্ত প্রায় প্রাণী সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করবার জন্যে বক্তৃতা দেবেন। আর সময় নেই, দেরি হয়ে গেছে, যা করবার এখনই করতে হবে।

ইউরোপে অত বড় একটা কনফারেন্স হয়ে গেলেও ইউরোপে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। কেউ কেউ মন্তব্য করল এসব বিজ্ঞানীদের বাড়াবাড়ি। এই ত আর একজন বিজ্ঞানী, চার্লস ডারউইন কবেই ত বলে গেছে যে পশুপাখি অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে পারে। আর তাছাড়া মানুষ পশুপাখি সব যদি মরে তবে তুমি বিজ্ঞানী তা রোধ করতে পার? এই ত বন্যা আর ভূমিকম্পে কত হাজার হাজার মানুষ মরে, তোমরা আটকাতে পার? ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে।

বিজ্ঞানীরা অবশ্যই ঢিলেঢালা এই মতবাদে বিশ্বাসী নন। ব্রিটেনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ ডেভিড মাইকেল,

যিনি এই কনফারেন্সে ব্রিটেনের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন তিনি ভিন্নমত পোষন করেন।

ডঃ মাইকেল বলেন পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য নিরন্তর যে সংগ্রাম চলছে সেই সংগ্রামে কয়েক জাতির কীট অনেক এগিয়ে গেছে। মানুষকে পরাজিত করে একদিন তারাই হয়ত পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে, তবে তাদের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ হবে কি না তা তিনি এখনই বলতে পারছেন না। রোম কনফারেন্সে তিনি এই কীট সম্বন্ধেই নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন। কিছু নমুনাও নিয়ে গিয়েছিলেন।

ডঃ মাইকেল এবার কেমব্রিজে ফিরে যাবেন। বলতে কি তিনি রোম এয়ারপোর্টে এসে গেছেন। বোমে আসবার সময় তিনি সঙ্গে কীট-পতঙ্গের প্রচুর নমুনা এনেছিলেন, সবই জীবন্ত। এদের মধ্যে কয়েক প্রকার কীট ত বেশ বিপজ্জনক সেজন্য সেগুলি বিশেষ আধারে আনা হয়েছিল যাতে না কীটগুলি সহজে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে।

উনি এবং আরও কয়েকজন প্রতিনিধি পাইপার নাভাহো বিমানে ফিরবেন। কীটভর্তি আধারগুলি এখন সেই বিমানে তোলা হচ্ছে, ডঃ মাইকেল নিজে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন।

তিনি ভাবছিলেন এইসব কীট যা তিনি সঙ্গে এনেছেন এরা কি সত্যিই মানুষের চেয়ে বেশি দিন বাঁচে? মানুষ যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন কি এরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে?

এই সব সর্বনাশা কীট কি করে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করছে এবং কি করে তাদের দ্রুত ধ্বংস করা যায়, কি করে এদের মধ্যে মহামারী সৃষ্টি করা যায়, তা নিয়ে ডঃ মাইকেল এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী বিরামহীণ গবেষণা করছেন।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি রোমে এত শীত থাকার কথা নয় কিন্তু কয়েকদিন হল আলপস পাহাড় থেকে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস ধেয়ে আসছে। এইরকম এক ঝাপটা বাতাস এসে ডঃ মাইকেলকে

কাঁপিয়ে দিল।

মাফলারটা গলায় ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে গ্রেট কোটের কলার তিনি কান পর্যন্ত তুলে দিলেন।

শুধু ইটালিতে নয়, সারা ইউরোপেই নাকি এবার প্রচণ্ড শীত পড়েছে। উত্তর মেরু থেকে নাকি শীতল তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। কলের জলে পাইপে পর্যন্ত জল জমে পাইপ ফাটিয়ে দিচ্ছে।

রোমে এসময় এমন শীত থাকার কথা ত নয়ই উপরন্তু রোম এয়ারপোর্টে এবার তুষারপাত হচ্ছে। বিমান চলাচলে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্যে স্নো-প্লাউ চালিয়ে এয়ারপোর্ট মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা হচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের বেগ হঠাৎ যেন বেড়ে গেল। যেন ঝড়ের পূর্বাভাস।

ঝড় যদি ওঠেই, তাহলেও ভয় নেই কারণ এই পাইপার নাভাহো বিমান ঝড় কাটিয়ে ওড়বার মতো মজবুত করেই তৈরি করা হয়েছে।

ডঃ মাইকেল একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন। আকাশের রং ভাল নয়, মেঘ জমছে বটে তবে মনে হয় যে সাইক্লোনের মতো কিছু একটা হবে না। আর সাইক্লোন হলেও পাইপার তা কাটিয়ে মেঘ ফুঁড়ে আরও ওপরে উঠে তাদের নিরাপদে লণ্ডনে নামিয়ে দেবে।

কীট-পতঙ্গ ভর্তি আধারগুলি বিমানে উঠে গেল। বিমান ছাড়তে আর একটু দেরি আছে। এক জার কফি হলে মন্দ হয় না। ডঃ মাইকেল কফির আশায় এয়ারপোর্টের টার্মিনাল বিলডিং-এ ঢুকলেন। আঃ কি গরম! সেণ্ট্রাল হিটিংএর সাহায্যে বিলডিংটা গরম রাখা হয়েছে।

কফিবারে গিয়ে দেখলেন পাইপার বিমানের পাইলটও সেখানে কফি খাচ্ছে। তিনি নিজে কফির অর্ডার দিয়ে পাইলটকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবহাওয়ার নতুন কিছু খবর আছে?

পাইলট ইটালিয়ান। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বলল, না, নতুন কিছু খবর এখনও পাই নি তবে আলপস আর অস্ট্রিয়ার

ওপর ভীষণ তুষারপাত হচ্ছে। ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলে মেঘ জমছে তবে আমরা ঠিক পেরিয়ে যাব। পাইপার ত দুরন্ত আবহাওয়ার জন্যেই তৈরি।

ওয়েল, আর উই বেডি? চওড়া কাঁধ, লম্বা চওড়া চেহারা. ছোট্ট একটু সাদা দাড়ি, উচ্চারণে মার্কিনী টান। তারপর একটু হেসে বললেন, আমরাই তো শেষ দল পড়ে আছি, তাই না? আর সবাই ত চলে গেছে। কি প্রফেসব, আমরা মানুষরা পৃথিবী শাসন করতে পারব ত? নাকি গুবরে আর ল্যাদা পোকারা আমাদের কুরে কুরে খেয়ে ফেলবে?

ডঃ মাইকেল বিরক্ত হলেন লোকটার কথা বলার ভঙ্গি দেখে। তিনি শুধু বললেন, আপনি, আপনার ছেলে ও নাতি হয়ত এখনও পৃথিবী শাসন করতে পারবেন কিন্তু তারপর কি হবে তা আমি বলতে পারি না, ইট অল ডিপেণ্ডস।

আরে প্রফেসর মাইকেল আপনি অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমরা এখনও অনেক অনেক দিন খবরের কাগজেব হেডলাইন হয়ে থাকব।

ঐ মার্কিনী বিজ্ঞানী ঠিকই বলেছিলেন। তাঁরা সত্যিই খরবের কাগজের হেডলাইন রচনা করেছিলেন কিন্তু এইভাবে যে হেডলাইন হতে পারে তা কেউ ভাবতে পারে নি।

সকলে গুটি গুটি পাইপার প্লেনের দিকে এগিয়ে চললেন। প্লেনটা চার্টার করা। কিন্তু এদিকে যে হাওয়ার বেগ বাড়ছে, যাত্রীদের মুখে যেন ঝপটা মারছে। রানওয়ের ওপর দিয়ে সকলে যতদূব সম্ভব তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল।

ডঃ মাইকেলই আগে চলেছেন। তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন একজন অ্যামেরিকান। ইনি থাকেন চিকাগোতে, একজন বিখ্যাত এনটমোলজিস্ট বা কীটতত্ত্ববিদ। সঙ্গে রয়েছে তাঁর স্ত্রী, গায়ে পুরু ফার কোট, দুটো কান ঢেকে দিয়েছেন, মুখটা লম্বা দেখাচ্ছে, নাকের

ডগা লাল। মহিলা তাঁর স্বামীর সমান লম্বা, শীতে বোধহয় খুব কাতর হয়েছেন, চলন দেখে সেইরকম মনে হচ্ছে।

কাঁধে এয়ারলাইন কম্পানির ফ্লাইট ব্যাগ ঝুলিয়ে মহিলাকে অনুসরণ করছে লণ্ডন টাইমস এর একজন যুব সায়েন্স রিপোর্টার। তারপর আরও কয়েকজন ছিলেন।

একে একে সকলে প্লেনে উঠে আরাম করে সিটে বসে সিটবেল্ট এঁটে নিলেন। প্লেনের একেবারে পিছনে ছোটখাটো কয়েকটা জন্তু কিচিমিচি করে উঠল। প্লেনও গর্জন করে উঠল, এঞ্জিন চালু হয়েছে।

পাইপার প্লেন চালু হল। রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলল। সেই মার্কিন এনটমোলিজিস্টের পত্নী বিমান ভ্রমণ একেবারেই পছন্দ করেন না, ভয় পান। প্লেন নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর বাহু আঁকড়ে ধরেছেন।

স্বামীকে বললেন, ফ্রাই যদি করবেই ত এই একটা বাজে প্লেনে উঠলে কেন? রোম থেকে কি প্যান অ্যামেরিকান বা টি-ডব্লু-এ. আমাদের অ্যামেরিকান কোনো সারভিস নেই।

উপায় নেই জেনিফার, সব ব্যবস্থা সরকার করে দিয়েছেন, অ্যামেরিকান কীটতত্ত্ববিদ বললেন, তাছাড়া আমাদের এয়ার লাইনের যাত্রিবাহী বিমানগুলো এতসব জীবজন্তু পোকামাকড়ের নমুনা প্লেনে তুলতে দেয় না, সেজন্যে বিশেষ বিমানের বা কার্গো প্লেনে ব্যবস্থা করতে হয়, তুমি তো এসব জান।

পাইপার প্লেন আকাশে উঠল। পঁচিশ হাজার ফুট ওপরে উঠে সোজা উত্তর দিকে উড়ে চলল। আকাশ ঘোর নীল। টাসকানির পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে ওরা উড়ে চলেছে। নিচে পাহাড়গুলোর ওপর বরফ জমে সাদা হয়ে গেছে, চকচক করছে।

কো-পাইলট যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছিল। সে বলল, এমন দেখা যায় না, ফেব্রুয়ারি মাস পড়তে চলল, টাসকানির পাহাড়ের মাথায় এসময়ে বরফ দেখা যায় না।

কথাটা শুনে পাইপারের একমাত্র মহিলা যাত্রী সেই জেনিফার নারভাস হয়ে গেল। স্বামীর দিকে মুখ তুলে ঢোক গিলল। মহিলা সত্যিই ভয় পেয়েছেন অথচ ভয় পাবার কোনো কারণ এখনও ঘটেনি।

কো-পাইলট ককপিটে ফিরে যেতে পাইলট তাকে ইটালিয়ান ভাষায় যা বলল; মহিলা যদি কো-পাইলটের সঙ্গে ককপিটে যেতেন এবং দুই পাইলটের কথা শুনে বুঝতে পারতেন তাহলে বোধহয় চিৎকার করে বলতেন, এখনি প্লেন ফেরাও, রোম ফিরে চল।

পাইলট ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলছিল, কারণ যাত্রীরা যদি তাদের কথা বুঝতে পারে তাহলে ভয় পাবে।

পাইলট কো-পাইলটকে বলছিল, এইমাত্র রেডিওতে খবর পেলুম সামনে কোল্ডফ্রন্ট আলপসের দিক থেকে ধেয়ে আসছে। ঐ দেখ সামনে চেয়ে দেখ, ঐ দেখ দূরে কালো চাপ চাপ মেঘ।

পাইলট বলল, কিউমিউলো নিমবাস পুঞ্জ পুঞ্জ জলদ মেঘ, আমরা ঐ মেঘ-সাগরের দিকেই চলেছি। তা গেলে ত চলবে না, তুমি রোম এয়ারপোর্টের সঙ্গে কনট্যাক্ট কর, আমাদের কোর্স চেঞ্জ করতে হবে। টুলুজকেও কণ্ট্যাক্ট করবে, আমরা এখন কয়েক ডিগ্রি পশ্চিম দিকে যাচ্ছি।

কো-পাইলট কানে হেডফোন লাগিয়ে রোম আর টুলুজ এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলল। কথা শেষ করে হেডফোন যখন নামাল তখন তার মুখ গম্ভীর।

পাইলট জিজ্ঞাসা করল, ওরা কি বলল?

ওরা বলল ঐ মেঘ সারা আলপসের মাথায় জমে রয়েছে।

পাইলট চুমকুড়ি কেটে বলল, দুত্তোর ছাই তবে ঘাবড়িও না, আমরা আরও পশ্চিমে যাব, ওদিকে মেঘ জমেছে বলে মনে হচ্ছে না, ভয় পেয়ো না, আমি আরও খারাপ আবহাওয়ায় প্লেন চালিয়েছি।

কো-পাইলট ভরসা পেল না। সে দেখল পূব থেকে পশ্চিমে সব

দিকেই কালো কালো মেঘ জমে রয়েছে, ওপরে নিচে সর্বত্র। পাহাড়ের মাথা যেন কামড়ে ধরে রয়েছে। সে জানে প্লেনের পক্ষে এই মেঘ ফুঁড়ে যাওয়া বিপজ্জনক। এই মেঘ চাপ চাপ হয়ে জমে থাকে, কখন কোথায় কি বিপদ ঘটাবে কে জানে? এই মেঘ চুপচুপে জলভর্তি থাকে কিন্তু যা ঠাণ্ডা, জল জমে বোধহয় বরফ হয়ে গেছে। ওর ভেতর দিয়ে ওড়বার সময় শিলা বর্ষণ হবে, সে শিলা কতবড় এবং কি বিপদ ঘটাবে কে বলতে পারে?

কো-পাইলট চুপ করে বসে রইল। সে ভাবতে লাগল প্লেনের উইণ্ডশিল্ড কি সেই তীব্র শিলাবর্ষণ সহ্য করতে পারবে? জল যতক্ষণ মেঘের মধ্যে থাকে ততক্ষণ বেশ তরল অবস্থাতেই থাকে কিন্তু সেই অত্যন্ত শীতল জল যখন প্লেনের গায়ে জোরে আঘাত হানে তখন আর সে জল থাকে না, কঠিন শিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এমন কি করে হয় কে জানে।

চারদিক যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। পাইলট ত ভীষণ একগুঁয়ে। কি হবে কে জানে!

তবুও সে ভয়ে ভয়ে একবার পাইলটের দিকে চেয়ে দেখল। পাইলট দিব্যি বসে আছে, যেন কোনো চিন্তা নেই. মনে মনে বলল, পাইলট যখন ভয় পায় নি তখন ভয়ের কিছু নেই বোধহয়।

পাইপার নাভাহো প্লেনগুলো ত এই রকম আবহাওয়ার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখাও হয়েছে যে, এরকম তীব্র আবহাওয়ায় পাইপার প্লেনের কোনো ক্ষতি হয়নি।

উইণ্ডশিল্ড গরম রাখা হয়। বরফ জমতে পারে না, জমলেও বরফ সরাবার জন্যে লম্বা আর মজবুত ওয়াইপার ত আছেই, আর ডানার ওপর যাতে বরফ জমে, প্লেনকে ভারি করতে না পারে তার ব্যবস্থাও করা আছে। তবে আর ভয় কিসের?

কো-পাইলটের হঠাৎ মনে পড়ল বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের ওপর মার্কিন এয়ারফোর্সের পাঁচখানা বিমান টেক অফ করার আধঘণ্টার মধ্যে কোথায়

ভ্যানিস হয়ে গেল।

তাদের খোঁজে একখানা মেরিনার প্লেন পাঠান হল। এই মেরিনার প্লেন ভেঙে পড়তে পারে না, ভেঙে পড়লেও জলে ডুববে না কিন্তু সেই মেরিনার প্লেনও কোথায় ভ্যানিস হয়ে গেল, কোনোও পাত্তাই পাওয়া গেল না।

ভাগ্যিস এটা বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল নয়। কো-পাইলট ভাবে।

পাইলট এবং কো-পাইলট দুজনেই জানে আজকালকার বিমান এমন মজবুত করে তৈরি করা হয় যাতে তারা যে কোনো রকমের আবহাওয়া সহ্য করতে পারে। আজকাল প্রযুক্তি বিদ্যার প্রচুর উন্নতি হয়েছে, এঞ্জিন খুব মজবুত করে তৈরি করা হয়। কিন্তু মজবুত এঞ্জিনের মধ্যে এবং অন্যত্র এমন কিছু অংশ থাকে যেগুলি সূক্ষ্ম যন্ত্র. এগুলি সামান্য ধাক্কায় বিকল হয়ে পড়ে। অনেক সময় বিমান ধ্বংস হয় এই সব ছোট ও সূক্ষ্ম যন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে।

প্লেনে একটা প্রেসার পাম্প আছে যার কাজ হল কতকগুলি পাইপকে সচল করা যাতে উইং বা উইণ্ডশিল্ড থেকে পাইপ জমা বরফ সরিয়ে দেয়। প্রায় না হলেও এই পাইপ ফেটে যায়। 'মেটাল ফেটিগ' বলে একটা কথা আছে। পাইপ ফেটে যাওয়ার মেটাল ফেটিগ একটা কারণ।

প্লেন মেঘের রাজ্যে এসে পড়ল। মেঘ এখন পাতলা। এরকম পাতলা মেঘ থাকলে ভয় নেই।

পাইলট হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, মাই গড লুক অ্যাট দ্যাট, সর্বনাশ, এসব কি হে?

কো-পাইলটও দেখেছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, চোখ বড় হয়েছে। সর্বনাশের আর বুঝি দেরি নেই! পাতলা কালো মেঘ কোথায়? এ তো কালো পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ, জলে চুপচুপ করছে। এই মেঘের ভেতর দিয়ে যাবে কি করে?

কিছু ভাল করে বোঝবার আগেই ওরা ফাঁদে আটকে গেল।

চারদিক অন্ধকার দৃষ্টি চলে না। অতি শীতল জলবিন্দুগুলি চোখের নিমেষে শিলায় পরিণত হয়ে পাইপার প্লেনের চার দিকে আঘাত হানতে লাগল।

পাইলট উইণ্ডশিল্ড হিটার আগেই চালু করে দিয়েছে কিন্তু তাতেও বুঝি সামাল দেওয়া যাবে না। সে চিৎকার করে উত্তেজিত কণ্ঠে কো-পাইলটকে বলল, পাম্প চালাও, ডি-আইসিং বুটের পাম্প চালু কর, কুইক!

কো-পাইলট কণ্ট্রোল বোর্ডে একটা বোতাম টিপল। প্লেনের দু'দিকের উইং-এর ওপর এক ধরনের মজবুত প্লাস্টিকের লম্বা ব্লাডার আছে, পাম্প চালালেই সেই ব্লাডার গোল হয়ে ফুলে ওঠে, বরফ পিছলে পড়ে যায়, জমতে পারে না।

বোতাম টিপে দিয়ে কো-পাইলট সাইড উইণ্ডো দিয়ে দেখল বারের ব্লাডার ফুলে উঠেছে, জমা বরফ পিছলে পড়ে যাচ্ছে পাইলটও তার পাশের জানালা দিয়ে দেখল ওধারে উইং-এর বরফ পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

পাইলট বলল, ভয় নেই, আমরা শিগগির এ থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।

পিছন দিক থেকে সেই অ্যামেরিকান এনটমোলজিস্ট কখন উঠে এসেছে। পাইলটকে লক্ষ্য করে বলছে, আরে ব্যাপারটা কি হচ্ছে? মনে হচ্ছে প্লেনের পিছন দিকটা বুঝি ভেঙে পড়ে যাবে।

পাইলট বলল, ও কিছু নয়, উইং-এর ওপর যে বরফ জমছে সেই বরফ পিছলে পিছন দিকে আঘাত করছে, তাই এই আওয়াজ, ভয়ের কিছু নেই।

অ্যামেরিকান তবুও দাঁড়িয়ে রইল। ইতিমধ্যে পাইলট সামনের দিকটা একবার দেখে নিল? কতক্ষণে এই মেঘের বিপজ্জনক অরণ্য কাটিয়ে উঠবে বুঝতে পারল না। ঘাড় ফিরিয়ে অ্যামেরিকানকে বলল, আপনি প্লিজ আপনার সিটে ফিরে যান, সবাইকে বেল্ট আঁটতে

বলুন, আপনি নিজেও।

কথাগুলো চীৎকার করেই বলতে হল কারণ নীরেট বরফের টুকরো প্লেনের গায়ে আঘাত করছিল, খুব জোরে আওয়াজ হচ্ছিল, কথা শোনা যাচ্ছিল না।

পাইলটের কথা শেষ হয় নি, বলল, প্রোপেলারে বরফের টুকরো ধাক্কা খেয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ছে, প্লেনের গায়েও আঘাত করছে, আওয়াজ হচ্ছে বটে কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। ও-কে ?

পাইলট একটু হেসে ঘাড় ফিরিয়ে নিজের কাজে মন দিল। অ্যামেরিকানও ফিরে যেয়ে সকলকে বলল কি ঘটেছে।

চিফ, বরফ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি জমছে আর ঐ বরফের স্তূপ বুঝি প্লাস্টিকের ব্লাডারকে দাবিয়ে দিচ্ছে, আমি তো মিনিটে মিনিটে পাম্প চালু করছি, কি ব্যাপার বল ত ? আমার ত ভাল মনে হচ্ছে না।

ভয় পেয়ো না, বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখ। পাম্প চালু রাখ, প্লেনের ভেতরের প্রেসার ঠিক আছে ত ?

তা ঠিক আছে।

গুড, আমরা শিগগির বিপদ কাটিয়ে উঠব।

পাইলট বিমানের কণ্ট্রোলের দিকে মন দিল, চেষ্টা করতে লাগল প্লেনটাকে সোজা রাখতে। কিন্তু প্লেন যেন তখন পাগল হয়ে গেছে। এদিক ওদিক হেলছে, দুলছে, আবার মাঝে মাঝে সোজা হয়েও যাচ্ছে।

কো-পাইলট চিৎকার করে উঠল। সে ভয় পেয়েছে। সে বলল চিফ উইং-এর ব্লাডারগুলো আর ফুলছে না, দ্রুত বরফ জমছে, বলতে বলতে সে পাম্পের বোতামটা প্রাণপণ জোরে চেপে ধরল।

পাইলট বলল, সে কি ? এদিকে প্রেসার ত ঠিক রয়েছে, কি হয়েছে ? পাইলটও রীতিমতো উৎকণ্ঠিত।

মাথা নাড়তে নাড়তে কো-পাইলট বলল, জানি না, জানি না, আমার মাথা ঠিক নেই।

তাদের জানবার আর সুযোগ হয় নি। তারা বোধহয়, একটা এস

ও এস পাঠাতে পেরেছিল। কোনো কোনো এয়ারপোর্ট একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট বিপদ সংকেত শুনেছিল, পাইপার নাভাহো প্লেন ইন ডেঞ্জার ...পাইপার প্লেন ইন ডেঞ্জার...পাইপার প্লেন আলপস...।

পরের তিন মিনিটের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। পাইলট শেষ পর্যন্ত তার মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিল। প্লেন বাঁচাবার জন্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছিল, কপালে ঘাম জমে উঠছিল।

দুই দিকের উইং-এ এত বেশি বরফ উঁচু হয়ে জমে উঠল যে প্লেন তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। তারপর প্লেন তীরবেগে পাহাড়ের দিকে পড়তে লাগল। পাইলট কন্ট্রোল ছাড়ে নি, কিন্তু সব বৃথা।

বিমানের যে সব যাত্রী ভয়ে চোখ বোজেনি বা জ্ঞান হারায়নি তারা সভয়ে দেখল সাদা বরফ ঢাকা পাহাড়গুলো যেন দ্রুত তাদের দিকে উঠে আসছে। একটা ডানা ভেঙে পড়ল। প্লেনটা কাত হয়ে গেল তারপর সজোরে পাহাড়ে আঘাত করল। একটা এঞ্জিন সশব্দে ফেটে গেল। তারপর চারদিক নিস্তব্ধ। সাদা বরফ ঢাকা মাইলের পর মাইল পাহাড় শান্ত। বিমানের ভেতর তখনও যারা বেঁচে ছিল তাদের আর্তনাদ শোনবার জন্যে কেউ সেখানে হাজির ছিল না।

সুইটজারল্যাণ্ডের একটা উঁচু পাহাড় চূড়ায় পাইপার প্লেনটা ভেঙে পড়েছিল।

মাউন্টেন রেসকিউ টিমের ক্যাপটেন ফিলিপ স্পিলার মোটা কাঠের টেবিলের ওপর বিছানো বড় ম্যাপখানা ঝুঁকে পড়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। এক সময়ে মাথা তুলে বললেন, অসম্ভব!

ক্যাপটেনের আশেপাশে আরও কয়েকজন অপেক্ষা করছিল। কেউ কেউ বাইরে বেরোবার জন্যে পোষাক ও জুতো পরে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল, কারও হাতে আইস অ্যাক্সও ছিল।

ক্যাপটেন স্পিলার বলল, মাউণ্ট ডোম-এ পাইপারটা ভেঙে

পড়েছে, অবস্থা এখন এমন খারাপ যে ওখানে মানুষের ওঠবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সকলে ক্যাপটেনের মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, তুমি যে হেলিকপটার পাঠিয়েছিলে? পাইলট কি বলেছে?

সে বলেছে দুটো অ্যাভালান্স জমেছে, এতক্ষণে হয় ত নামতে আরম্ভ করেছে।

এমন সময়ে ঘরে এক ঝলক নিষ্ঠুর শীতল হাওয়া ঢুকল। কাঠের কেবিনের কাঠের দরজা খুলে ছোটখাটো একজন মানুষ লেদার ব্রিচেস আর হাই বুট পরে ঘরে ঢুকেই দরজা চেপে বন্ধ করে দিয়ে বলল,

ইস্, আবার বরফ পড়ছে। তার উচ্চারণে ফরাসি টান। সে বলল, শিগগির ব্লিজার্ড আরম্ভ হবে, এখন বাইরে বেরোন মানে মৃত্যু।

সভয়ে একজন জিজ্ঞাসা করল, ব্লিজার্ড! কোথায়? এখানে?

না হে এখানে নয়, আরও ওপরে, আমরা যে পথ দিয়ে মাউন্ট ডোম-এ যেতুম।

ক্যাপটেন স্পিলার বলল, হেলিকপটারে আমাদের যে অবজার্ভার ছিল সে বলেছে প্লেন যেখানে ভেঙে পড়েছে সেখানে প্রাণের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ভাঙা প্লেনের ওপর তুষার জমেছে যদিও বা কেউ বেঁচে থাকে তাহলে এই দারুণ ঠাণ্ডা এতক্ষণ তাকে মেরে ফেলেছে, তুমি কি বল জ্যাক?

যে লোকটি এইমাত্র দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছিল তাকে ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করল, আমি একমত, আমি এই পাহাড় চিনি, এই ব্যাড ওয়েদারও জানি, এ বছরে ত এর মধ্যেই হাজার দশ অ্যাভালান্স নেমেছে, আর কত নামবে কে জানে? এত খারাপ শীত আমার ত মনে পড়ছে না, বিটার বিটার কোল্ড।

তবুও ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ওখানে হেলিকপটার থেকে লোক নামানো যায় না?

অসম্ভব ফিলিপ, কপটার যাবে কি করে? এতক্ষণে ওখানে ব্লিজার্ড আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রায় দু'দিন তো হতে চলল, এতক্ষণ কেউ বেঁচে নেই, মনে রেখ প্লেনটা ভেঙে পড়েছে এখান থেকে আরও এগারো হাজার ফুট ওপরে, ওখানে যদি মানুষ নামানোও যায় তাহলে জমা বরফের স্তূপ সকলকে নিয়ে নিচে নামতে আরম্ভ করবে।

তাহলে তুমি কি বল জ্যাক? ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করে।

বসন্ত পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে, উপায় নেই, বরফ গলবে, পথ পরিষ্কার হবে, তখন ছাড়া ওঠা যাবে না, এই ধর আরও দু'মাস, মাচের শেষে।

তাই হবে, তুমি তো এক্সপার্ট, তোমার ওপর আর কথা কি, আমরা এই দু'মাস অপেক্ষাই করব।

এই মাউনটেন রেসকিউ হেডকোয়ার্টার থেকে আরও পঞ্চাশ গজ দূরে আর একটা কাঠের কেবিনের ভেতরে এক ডজন পুরুষ ও নারী অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করছিল। এরা সব সাংবাদিক। ইউরোপের কয়েকটা নামী নিউজ এজেন্সি বা খবরের কাগজের এরা রিপোর্টার বা ফটোগ্রাফার। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ পায়চারি করছে।

একজন একহাতে ক্যামেরা আর অপর হাতে টেপ রেকর্ডার নিয়ে প্রস্তুত। ক্যাপটেন ফিলিপ স্পিলার কেবিনে ঢুকলেই তাঁর ফটো তুলে নেবে ও তার বক্তব্য রেকর্ড করে নেবে। প্রেস কনফারেনসের জন্য ক্যাপটেন ফিলিপ স্পিলার এখনি আসবেন।

প্লেন ক্র্যাশের খবর জেনিভাতে পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গেই সে খবর সারা ইউরোপে তথা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞানের মস্ত বড় ক্ষতি হয়ে গেল বলে এবং বিজ্ঞানীদের ফটোসহ পরিচয় দিয়ে প্রায় সব খবরের কাগজেই খবর ছাপা হয়েছিল। একটা কাগজ হেডলাইন করেছিল "নেচার হিটস ব্যাক অ্যাট সায়েন্স"।

অ্যালপস পর্বতের সঙ্গে ম্যাটারহর্ণ এবং মাউণ্ট ডোম-এর মধ্যে

অবস্থিত ছোট্ট পাহাড়ী শহর জেরমাট রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়ল। সাংবাদিকরা এখানেই হাজির হয়ে এখানকার ডেটলাইনে খবর পাঠাতে আরম্ভ করেছিল।

মাউনটেন রেসকিউ হেডকোয়ার্টারে খবর পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছবার চুবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু অর্ধেক পথও ওঠা যায় নি। অসম্ভব বলে উদ্ধার কাজ পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

ক্যাপটেন ফিলিপ স্পিলার কেবিনে ঢুকতেই সংবাদিকরা নড়েচড়ে বসল। ক্যাপটেন একা আসেনি, সঙ্গে জ্যাক নামে সেই ফরাসি এক্সপার্ট এবং হেলিকপটারের দু'জন পাইলট।

কোনো ভূমিকা না করে ক্যাপটেন সংবাদিকদের জানিয়ে দিল রেসকিউ পার্টি কি স্থির করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নানারকম প্রশ্ন কিন্তু ক্যাপটেন একটাই উত্তর দিল বসন্তের আগে অর্থাৎ মার্চের শেষে ছাড়া কিছুই করা যাবে না। অতএব প্রেস কনফারেন্স দশ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল।

একজন সাংবাদিক বলল, চল হে আমরা এখন অন্য খবরের সন্ধানে যাই। এযার ক্র্যাশের এই খবর কালই বাসি হয়ে যাবে।

সে খবর বাসি হয় নি।

ঠিক কথা, সাধারণ মানুষ বিমান দুর্ঘটনার খবর ভুলে গেল, মাখনের দাম, ডলারের অবমূল্যায়ণ, পেট্রলের দাম নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে লাগল।

কিন্তু বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয় যারা অ্যামেরিকার চিকাগোয় ছিল কিংবা ইংলণ্ডের কেমব্রিজ বা শেফিলডে, তারা?

তারা ত ভুলতে পারে না এবং ভুলে যায়ও নি। তারা সুইটজারল্যাণ্ডের সেই ছোট্ট শহর জেরমাটে অবস্থিত মাউনটেন রেসকিউ পার্টির সঙ্গে যোগ রেখে আবহাওয়া ও বরফ গলার খবর নিতে লাগল। তাদের ইচ্ছে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে এনে ভালভাবে কবর দেবে

তাহলে। ঐ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মৃতদেহগুলি নিশ্চয় বিকৃত হবে না।

অবশ্য ইংলণ্ড ও অ্যামেরিকার ডাক্তাররাও আত্মীয়দের আশ্বাস দিয়েছিল যে মৃতদেহ পচে যেতে পারে না। ডাক্তাররা বলেছিল—

চিন্তা কোরো না। ঐ ঠাণ্ডায় মৃতদেহ বছরের বছর পর অবিকৃত থাকে, নষ্ট হয় না, বিকৃত হয় না, পচে যায় না, খোনে নেকড়ের পালও নেই যে খেয়ে ফেলবে, দেহগুলি ঠিকই থাকবে নষ্ট হবে না।

কিন্তু হায়! ডাক্তারদের অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

উঃ কি শীত! সারা দেহ অবশ হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণাও যেন অনুভব করা যাচ্ছে না, স্নায়ু বলে কিছু আছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে তাদের আবয়ব বলে কিছু নেই বুঝি, তাদের বুঝি অস্তিত্বই নেই। দেহটা বুঝি জমেই যাবে। নাকি তিনি মারা গেছেন? অনুভূতিহীন অন্য এক জগতে বিচরণ করছেন। বিচরণ? কোথায়? তিনি ভাবছেনও না। অসাড় ও অনড় হয়ে পড়ে রয়েছেন।

ডঃ ডেভিড মাইকেল তখনও বেঁচে ছিলেন। তখনও! শেষ পর্যন্ত বাঁচেন নি। কয়েক ঘণ্টা পরে মারা গিয়েছিলেন। অদ্ভুত এক অনুভূতি তাঁকে আবৃত করেছিল। বেঁচে থাকলে হয়ত বলতে পারতেন।

ডান হাতটা কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশেই পড়ে রয়েছে কিন্তু কোনো ব্যথা অনুভব করছেন না। কিন্তু আশ্চর্য, চিন্তাশক্তি এখনও অবলুপ্ত হয় নি। বুঝতে পারছেন আর বেশি দেরি নেই। জীবন আস্তে আস্তে নিবে আসছে।

শরীর নাড়াতে পারছেন না কিন্তু চোখ দুটো ঠিক আছে। চোখের পাতা পড়ছে, উঠছে, দেখতেও পাচ্ছেন। তবে সব দিক যেন একটা ফিকে লাল কুয়াশায় ভরে আছে। কোনো গন্ধ? না, কোনো গন্ধই তো তিনি পাচ্ছেন না।

কিছু কি মনে পড়ছে?

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে অনেক দিন আগে তিনি যেন প্লেনে চেপে কোথা থেকে আসছিলেন। কতদিন আগে? কোথা থেকে আসছিলেন? কিছুই তো মনে পড়ছে না!

একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হয়েছিল। তারপর থেকে কিছুই তো মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, প্লেনের ভেতর অনেক মানুষের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ও ক্রন্দন যেন শুনেছিলেন। তারপর কি আর কিছু মনে পড়ছে?

মনে পড়ছে। সিটবেল্ট ছিন্ন হয়েছিল। প্লেনের পিছন দিকে যেখানে কয়েকটা ক্ষুদ্র প্রাণীর আর কীটপতঙ্গের নমুনার আধারগুলো ছিল তিনি বুঝি ছিটকে তাদের মধ্যে পড়েছিলেন। আধারগুলো ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। এইরকম কিছু যেন ঘটেছিল।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত পা মাথার ঘিলু সব কিছু যেন জমে গেছে, কোনো কিছুরই অনুভূতি নেই, হাত, পা, মাথা এমন কি সারা দেহটার অস্তিত্বই নেই বুঝি।

ডেভিড মাইকেলের মনে হচ্ছিল, তার দেহ খুব হালকা হয়ে গেছে, এত হালকা যে এ দেহ বুঝি এখনি শূন্যে ভেসে উঠবে। শূন্যে ভেসে উঠে কোথায় যাবেন? তিনি কি মরে গেছেন? মরে যদি গেছেই থাকেন, তাহলে চিন্তা করার শক্তি কোথা থেকে আসছে? পরলোকের ব্যাপারে ডেভিড মাইকেলের কোনো বিশ্বাস নেই, পরলোক বলে কিছু নেই।

ডেভিড মাইকেল কি ভাবছেন তা তিনি কি কাউকে কোনোদিন বলতে পারেন নি? কি ঘটল বা কি ঘটছে তাও তিনি কোনোদিন কাউকে বলতে পারেন নি।

ভাঙা বিমানটার বাইরে বুঝি সোঁ-সোঁ করে হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়ার শব্দই কি ডঃ মাইকেল শুনছেন? নাকি কোথাও কেউ অপূর্ব সঙ্গীত রচনা করছে। সত্যিই কি সুন্দর সঙ্গীত! স্বর্গীয় সঙ্গীত বুঝি একেই বলে। কি সুর তা ডঃ মাইকেল বলতে পারবেন না কিন্তু সেই সুর সব ভুলিয়ে দিচ্ছে!

ডঃ মাইকেল কি জেগে স্বপ্ন দেখছেন? কে বলতে পারে!

ডঃ মাইকেলের ডান হাতটা কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশেই পড়েছিল আর কাঁধের সেই অংশ কিসে যেন আটকে গিয়েছিল। ডঃ মাইকেল জানেন দুর্ঘটনার পর আহত ব্যক্তির যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে যন্ত্রণায় কাতর চিৎকার করে অথচ তাঁর হাতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আর তিনি কিছুই অনুভব করছেন না?

তবে মৃত্যুর বুঝি আর দেরি নেই। মৃত্যু কি সুন্দর! এরকম ভাবে মরতেই তো বেশ ভালো লাগে। বুঝতে পারছি মরে যাচ্ছি কিন্তু কোনো শোক বা দুঃখ নেই, কোনো যন্ত্রণাও নেই।

তাঁর দৃষ্টি এখনও ঠিক আছে। চোখের তারা এদিকে ওদিকে ঘোরাতে পারছেন। সব দেখতেও পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে তিনি যেন হাসছেন; মৃদু হাসি কিন্তু সত্যিই হাসছেন কি না তাও বুঝতে পারছেন না। নিজের দেহের ওপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

একটা লাল কুয়াশা যেন তাঁকে ঘিরে ধরেছে।

এই শেষবারের মতো ক্ষণিকভাবে মনে পড়ছে যেন। তিনি একটা প্লেনে চেপে কোথাও বুঝি যাচ্ছিলেন। সে বোধহয় অনেক দিন আগে। কোথায় বুঝি প্রচণ্ড জোরে একটা আওয়াজ হল। সেই প্রচণ্ড আওয়াজের পর আরও অনেক রকম আওয়াজ। কান্নার আওয়াজ, প্রার্থনা, আর কি সব বুঝি শুনেছিলেন। সিট বেল্ট ছিঁড়ে বুঝি ছিটকে পড়েছিলেন, একেবারে প্লেনের পিছন দিকে যেখানে মালপত্তর রাখা থাকে। সব কিছু ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল।

ছোট ছোট জীবজন্তুর খাঁচা আর পোকামাকড়ের আধারগুলো সব তাদের তাক থেকে পড়ে গিয়েছিল। মানুষগুলোও যেমন এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছিল, খাঁচা ও আধারগুলোও তেমনি!

ডঃ মাইকেলের মনে পড়ল, তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেন নি। একজন মহিলা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকার করছিলেন। মহিলা তো একজনই ছিলেন। জেনিফার। সেই মার্কিন

কীটতত্ত্ববিদের পত্নী। জেনিফার উইলকিনস আর তার স্বামীর নাম মরিস উইলকিনস, মনে পড়ছে কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে কারণ পরমুহূর্তে কিছু একটা ফেটে যাওয়ার ভীষণ আওয়াজ হল, সব কিছু থরথর করে কেঁপে উঠল।

প্রথম কয়েক মিনিট তীব্র যন্ত্রণা বোধ করেছিলেন তারপর বোধশক্তি রহিত হয়ে গেলেন। একটা পাঁজর ভাঙল বুঝি। কোথা থেকে রক্ত বেরিয়ে তাঁর ঠোঁটে লাগল। বেশ একটা মিষ্টতার স্বাদ পেয়েছিলেন অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে।

সময়ের কোনো হিসেব নেই। কি করে থাকবে, আর কি করেই বা সে হিসেব রাখবেন? সে চিন্তা তাঁর মাথায় আসেও নি, আসতে পারেও না, সে অবকাশও তিনি পান নি।

তিনি যে এখনও মারা যান নি সেটুকু খেয়াল তাঁর আছে। এখন শুধু অপেক্ষা করছেন জীবন কখন নিঃশেষিত হবে। ডঃ মাইকেল একদা হিন্দুদের গীতা পড়েছিলেন। ক্ষীণভাবে তাঁর যেন গীতার কথা মনে পড়ল, কি যেন বলেছে? মানুষ যেমন পুরনো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরে, দেহও বুঝি পুরনো হয়ে গেলে আত্মা নতুন দেহে প্রবেশ করে।

তাই তিনি ভাবছেন, কি করে তাঁর আত্মা অন্য একটা দেহে প্রবেশ করবে সেটা দেখতে হবে। দেখা কি যাবে? অনুভব করা কি যাবে? আত্মা কি কেউ দেখেছে?

লাল সেই কুয়াশা যেন সরে যাচ্ছে। বিমানের ওখানে বিরাট একটা গর্ত। সেই গর্ত দিয়ে সোঁ-সোঁ করে শীতল বাতাস ঢুকছে কিন্তু তিনি কোনো শীতলতাই অনুভব করছেন না, অসাড় হয়ে গেছে।

তিনি ছিটকে বিমানের শেষপ্রান্তে পড়েছেন, যেখানে পোকা-মাকড়ের নমুনার বাক্সগুলি র‍্যাকে সাজানো ছিল। সেগুলো এখন তাঁর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। দু'একটা বাক্স বুঝি ভেঙেও গেছে, তাদের মধ্যে কোনটায় যে অত্যন্ত বিপজ্জনক কীটের নমুনা ছিল তা

তাঁর মনে পড়ছে না। ইস, বিমানের সেই ভাঙা অংশটা দিয়ে তুষারের কিছু কঠিন টুকরো শিলাবৃষ্টির মতে ভেতরে ঢুকছে! বাইরে বুঝি তুষার ঝড় আরম্ভ হয়ে গেছে।

কীট-পতঙ্গ ছাড়া কয়েকটা ছোট ছোট প্রাণী ছিল যেমন, হ্যামস্টার, ফেরেট ইত্যাদি। একটা ওবাংওটাংও ছিল। সেটা বোধহয় শীতে জমে গেছে, চেয়ে আছে এই পর্যন্ত কিন্তু কোন দিকে? কিছুই বোঝা যাচ্ছ না।

সেই সকল পোকা-মাকড় আর ক্ষুদ্র প্রাণীদের অস্তিত্ব টের পেতে ডঃ মাইকেলের বেশ খানিকটা সময় লাগল। কিন্তু কতটা সময়? তা স্থির করবার ক্ষমতা ডঃ মাইকেল হারিয়ে ফেলেছেন।

ডঃ মাইকেলের মনে হল ঐ নমুনাগুলো বুঝি তাঁর সঙ্গে কোনো-ভাবে জড়িত। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল। এইগুলোকে তিনি তো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্লেনে লোড করিয়েছিলেন, ছোট বড় খাঁচা, স্পেসিমেন জার, বটল অ্যাকোয়ারিয়ম···।

কয়েকটা স্পেসিমেন জার আর প্লাস্টিক প্যাকেট তিনি নিজেই বুঝি বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্পষ্টভাবে কিছুই মনে পড়ছে না। কিছু একটা মনে করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। একটা অঙ্কর উত্তর বার বার ভুল হচ্ছে, অবশেষে বুঝি ঠিক প্রসেস মনে পড়ল আর উত্তরও মিলে গেল।

ডঃ মাইকেলেরও তাই হল। ক্ষণিকের জন্যে মনে পড়ল তিনি কীট-পতঙ্গের যে সমস্ত নমুনা সঙ্গে নিয়ে রোমে গিয়েছিলেন সেগুলো কঠোর আবহাওয়ায় ও পরিবেশে নিজেদের কিভাবে খাপ খাইয়ে নিয়ে বংশ বৃদ্ধি করছে তাই প্রমাণ করা তার উদ্দেশ্য ছিল।

নিজের ল্যাবরেটরিতে ডঃ মাইকেল সেগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা করেছেন তাদের বিভিন্ন তাপে ও পরিবেশে রেখে দেখেছেন যে সেগুলি নতুন পরিবেশে নিজেদের বেশ মানিয়ে নিচ্ছে। কয়েকটা জারে এমন কয়েকটা কীটের নমুনা ছিল যেগুলো মানুষের সবরকম

কীটনাশক ওষুধ দিব্যি হজম করে ফেলছে। কীটনাশক তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারছে না, একমাত্র পুড়িয়ে মারা ছাড়া তাদের ধ্বংস করার আর কোনো উপায় নেই।

ক্যালিফোর্নিয়াতে যেখানে কূপ থেকে পেট্রল তোলা হয় সেইখানে জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্রুড তেলের অগভীর পুকুর দেখা যায়। মাটি চুইয়ে তেল ওপর দিকে উঠে এই রকম ছোট ছোট অগভীর পুকুর সৃষ্টি হয়েছে।

ক্রুড তেলের এই সব পুকুরে কোনো রকম কীটপতঙ্গ বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্য! পেট্রোলিয়ম ফ্লাই নামে এক রকম মাছি এই তৈলাশয়ে দিব্যি বেঁচে থাকে, বংশ বিস্তার করে।

অ্যামেরিকাতেই ইউটা স্টেটে যে গ্রেট সল্ট লেক আছে তার জল সমুদ্রের জল অপেক্ষা ছ'গুণ বেশি লবণাক্ত। কীট-পতঙ্গ বেঁচে থাকার পক্ষে এই জল অনুকূল নয় তথাপি ঐ পেট্রোলিয়ম ফ্লাইরা এখানে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে যে লার্ভা বেরোয় তা এই জলে দিব্যি বেঁচে থাকে। তারপর বাচ্চা বেরোলে উড়ে চলে যায় ঐ তৈলাশয়ে।

আফ্রিকায় স্লাগ নামে খোলাবিহীন একরকম শামুক আছে। তারা রাতারাতি চারা গাছ খেয়ে শেষ করে ফেলে। তাদের কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না।

আফ্রিকাতেই কঙ্গো নদীর মোহানায় দু'ইঞ্চি লম্বা যে গোলিয়াথ বিটল আছে তারা তো পাথরের মধ্যে সিঁদ কাটতে পারে। যারা ফ্যান্টমের (অরণ্যদেব বা বেতাল) সচিত্র কাহিনীগুলি পড়েন তাঁরা জানেন আফ্রিকার নদীতে পিরানহা নামে একরকম মাংসাশী মাছ আছে। সেই নদীর জলে কোন জীব বা মানুষ পড়লে তার আর রক্ষা নেই। নিমেষে সে কঙ্কালে পরিণত হবে।

অস্ট্রেলিয়ার পুবে যে গ্রেট ব্যারিয়ার নামে প্রবাল বাঁধ আছে সেখানে নাকি কি একরকম কীট বাসা বেঁধেছে! সেই কীট প্রবাল বাঁধটি দ্রুত কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে। এদের কাউকেই রুখতে পারা

যাচ্ছে না।

ভারতেও ডি. ডি. টি এবং কতরকম কীটনাশক তেল ও পাউডার ছড়িয়ে এনোফিলিস মশককুল নাকি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু তবুও তারা ফিরে এসেছে এবং অপ্রতিহত গতিতে রাজত্ব চালাচ্ছে। অথচ কত বড় বড় ও শক্তিশালী প্রাণী পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে আর ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র কীটকুলকে মানুষ আয়ত্তে আনতে পারছে না।

জীবনের শেষ মুহূর্তে ডঃ মাইকেল এই কীটকুলের কথাই ভাবছিলেন। এরই মাঝে ভাসা ভাসা ভাবে নিজের স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের কথাও মনে পড়ছিল। তারা কতদূরে। কি করছে? হাসছে, কাঁদছে? কি খবর তারা পেয়েছে?

কোথায় যেন অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল। সত্যিই অর্কেস্ট্রা না মনের ভুল? আঃ সব কেমন শান্ত হয়ে আসছে। বাইরে ঝড়ের বেগ কমেনি। ঝড় বইছে, তুষার পড়ছে।

কিচ কিচ করে কিসের যেন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অতি কষ্টে কোনো রকমে ঘাড়টা ঘোরালেন। খাঁচার কোণ থেকে দুটো ইঁদুর গুলো খাঁচার বাইরে আসবার চেষ্টা করছে। ডঃ মাইকেল ভাবলেন আমার মতোই এরাও তো মরবেই আর বন্দীদশায় মরে কেন? একটা হাত তো গেছে, অতি কষ্টে অপর হাত দিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিতেই ইঁদুরগুলো বেরিয়ে গেল। কয়েকটা বড় ইঁদুর ছিল, সে কটাও কিভাবে বেরিয়ে পড়েছে। ওদের খাঁচা বোধহয় ভেঙে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে।

আর পারছেন না ডঃ মাইকেল। আর কতক্ষণ! চোখ বুজলেন। কিন্তু আবার একটা আওয়াজ। ধাতুর পাত্রের ওপর কে যেন নখ আঁচড়াচ্ছে। অতি কষ্টে আবার চোখ খুললেন।

এবার তিনি দেখতে পেলেন। প্রথমে ঝাপসা তারপর স্পষ্ট। চোখ ফোকাস করে দেখতে পেলেন, এক ঝাঁক লাল বিটল্। সেগুলি

গুটি গুটি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশির ভাগ সার বেঁধে চলেছে হাত-পা বা মাথা ছেঁড়া ভাঙা মৃত দেহগুলির দিকে।

আবার কুয়াশা, এবার কুয়াশার রং লাল নয়, গোলাপী। ডেভিড মাইকেল কি এখনও রং চিনতে পারছেন? ওটা কি সত্যিই কুয়াশা? নাকি ওঁর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে?

বিটল্? হ্যাঁ বিটল্! গুবরেপোকার সার তাঁর দিকে যেন এগিয়ে আসছে, কোনোরকমে চোখ ফোকাস করে গুবরেপোকার সার দেখতে লাগলেন। গুবরেগুলোকে মাইকেল চিনতে পেরেছেন। ওগুলোর নাম হারকিউলিস বিটল্, কি বিশ্রী দেখতে, কালো কালো দু'টো শুঁড় আছে। শুঁড় না বলে সিং বলাই ভাল, কি ধার! যে কোনো প্রাণির দেহে সেই শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে কুরে কুরে মাংস খায়। কোথাও কোনো কাঁচা মাংসের টুকরো কিংবা কোনো প্রাণির দেহ থেকে রক্ত ঝরতে দেখলে কোথা থেকে সেই গুবরের ঝাঁক এসে রক্তের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারপর কুরে কুরে মাংস খেতে আরম্ভ করে। ঝাঁকের পর ঝাঁক গুবরে এসে সব মাংস খেয়ে ফেলে, প্রাণিটা দেখতে না দেখতে শেষ হয়ে যায়, পড়ে থাকে তার কঙ্কাল। কি ভীষণ!

ডঃ মাইকেল তখনও দৃষ্টি হারান নি। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হারকিউলিস বিটলগুলো ধাতব একটা কিছুর ওপর দিয়ে তাঁরই দিকে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। আওয়াজ হচ্ছে, হাতের সব নখ দিয়ে কে যেন সেই ধাতব পদার্থটাকে আঁচড়াচ্ছে।

বিটলগুলো সামনের পা দুটো খানিকটা করে এগিয়ে দিয়ে, সেকেণ্ডখানেক থামছে আবার এগিয়ে আসছে। সবগুলোই কি হারকিউলিস বিটল্? ওদের সঙ্গে যেন স্ট্যাগ বিটল্ আর কলোরাডো বিটল্ও রয়েছে? এগুলো আকারে কিছু ছোট হলেও অত্যন্ত বিপজ্জনক, ডেঞ্জারাস।

এইসব গুবরে পোকার বিষয়, তাদের চরিত্র, তাদের অভ্যাস, সব

কিছু ডঃ মাইকেল উত্তমরূপে জানেন। এদের নিয়েই ওঁর জীবন কেটেছে। উনি জানেন পৃথিবীর সব রকম প্রকৃতি ও আবহাওয়ার সঙ্গে ওরা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে ও বংশবিস্তার করতে শিখেছে। মানুষের মতো ওরাও বেঁচে থাকতে চায়।

ডঃ মাইকেল হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেন, নিজের ইচ্ছেয় শান্ত হলেন না। তাঁর মৃত্যুর আর দেরি নেই। সেই মৃত্যুই তাঁর সব কিছু অসাড় করে দিচ্ছে। এখনও যেটুকু বোধশক্তি তাঁর মধ্যে জেগে রয়েছে সেটুকু তাঁর কানে কানে খুব মৃদুস্বরে কি বলল যেন।

নখ আঁচড়ানো আওয়াজ একটু একটু করে জোর হচ্ছে। পোকাগুলো তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। এবার তারা কি করবে তা তিনি জানেন। এই পোকাগুলো নিয়ে তিনি নানা প্রাণির ওপর পরীক্ষা করেছেন কিন্তু মানুষের ওপর কখনও পরীক্ষা করেন নি। এখন তিনি নিজেই তাদের পরীক্ষার বস্তু হলেন যাকে বলে হিউম্যান গিনিপিগ, কিন্তু পরীক্ষার ফল জানবার জন্যে তিনি বেঁচে থাকবেন না।

পোকাগুলো আসবে, তাঁকে কুরে কুরে খেয়ে শেষ করবে তারপর একটু উত্তাপের মধ্যে তাঁরই অবশিষ্ট দেহ বা পোশাকের খাঁজে ও পকেটে আশ্রয় নেবে। তারপর তারাও মরবে কিন্তু মরবার আগে নিজেদের সংখ্যা অপেক্ষা দশ বিশ গুণ ডিম রেখে যাবে, তারপর যথাসময়ে সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে। এইভাবে চলবে। মানুষ যে-হারে ধ্বংস করবে এবং যদি ধ্বংস করতেই পারে—তথাপি তারা তাদের আরও অনেক বেশি সংখ্যায় বংশ বৃদ্ধি করবে।

ডঃ ডেভিড মাইকেলের কাঁধের কাছে দেহের যে অংশ থেকে ডান হাতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেখানে কিছু রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল, কিছু তাজা রক্তও ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। বুকের কয়েকটা পাঁজর ভেঙে মাংস ফুঁড়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছিল, সেখানেও রক্ত।

সেই রক্তের গন্ধে ব্লাডসাকার বিটল্, রক্তচোষা পোকাগুলো এসে পড়েছে। আগে তারা জমায়েত হল ক্ষতস্থানে। আরও আসছে।

ক্ষতস্থান যখন ভরে গেল, একটাও পোকার যখন আর জায়গা নেই তখন তারা আস্তে আস্তে তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ডঃ মাইকেল অনুভব করতে লাগলেন, কেউ বুঝি তাঁর শরীরে শত শত সূক্ষ্ম স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সরু ছুঁচের ডগায় বুঝি খাঁজ-কাটা আছে। সেই ছুঁচ ভেতরে কেউ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ক্ষতস্থানগুলো আগেই বুঝি অসাড় হয়ে গিয়েছিল, তাই সেখানে তিনি যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন না।

সারা দেহের বাকি অংশে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল। ডঃ মাইকেল আর সহ্য করতে পারলেন না। গলা ঘড় ঘড় করতে লাগল। চোখ উল্‌টে গেল। তারপর···তারপর সব কালো জমাট বাঁধা অন্ধকার।

ডঃ ডেভিড মাইকেলের মৃত্যু হল। আর কোনো যন্ত্রণা নেই, মৃত্যু এসে সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিল।

ডঃ ডেভিড মাইকেলের লাশ যেখানে পড়ে ছিল সেখান থেকে কুড়ি ফুট দূরে, ককপিটের কাছে কয়েকটা লাশ এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ছিল যে সেদিকে চাওয়া যায় না। লাশগুলো জড়াজড়ি করে পড়ে ছিল কারও পা ভেঙে হাড় বেরিয়ে পড়েছে, কারও মুখ ভেঙে দাঁত বেরিয়ে গেছে, একজনের চোখ যেখানে থাকবার কথা সেখানে চোখ নেই, রক্ত জমা দু'টো গর্ত। চশমার কাঁচ তো গুঁড়িয়ে গেছেই, ফ্রেমটা চূর্ণবিচূর্ণ। চারটে লাশ এক কোনে জড়াজড়ি করে পড়ে রয়েছে।

সেই অ্যামেরিকান এনটমোলজিস্ট, যার নাম মরিস উইলকিনস ও ও তার বৌ জেনিফার যে মহিলা, বিমান-ভ্রমণের ভয়ে ভুগতেন, এরা দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ। মৃত্যুর আগে জেনিফার তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছিল। স্বামী আগে মরেছে, মাথাটা ফেটে দু'ফাঁক হয়ে গেছে আর জেনিফার মরেছিল কয়েক সেকেণ্ড পরে। বিমানের একটা ভাঙা অংশ তার পিঠে বিঁধে গিয়েছিল। শ্যক ও রক্তমোক্ষণের ফলে তার

মৃত্যু হয়েছিল।

পাইলটের শিরদাঁড়া আর কো-পাইলটের ঘাড় ভেঙে গেছে। সে দৃশ্য যেমন করুণ তেমনি বীভৎস।

মৃত্যুর পূর্বে ডঃ ডেভিড মাইকেল দেখেছিলেন, এক ঝাঁক রক্তচোষা গুবরে পোকা, যাদের দু'টো করে লম্বা শুঁড়, ছটা পা, নিচের দিক কালো, পিঠ লাল কিন্তু মাঝে মাঝে কালো কালো ছোপ। লম্বায় বোধ হয় মোট ছ' ইঞ্চি হবে। ছোট একটা পাখি বললেও হয় কিন্তু দেখতে কুৎসিত, দেখলেই ভয় লাগে।

সেই ব্লাডসাকার বিটল্ যাদের নাকি একটা ডাক নাম আছে, 'যমের ঘোড়া', সেই পোকার দলকে মাইকেল দেখেছিলেন, দল বেঁধে তারা তাঁর দেহের ভেতরে ঢুকে পড়েছে, ক্ষতস্থানে শুঁড় বিঁধিয়ে দিয়েছে।

এই দৃশ্য দেখার আর কারও সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয় নি কারণ কেউ তখনও বেঁচে ছিল না।

ডেভিড মাইকেল ও জেনিফার উইলকিনস দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে এমন আঘাতের ফলে, যার জন্যে তাদের শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। দগদগে সেই ক্ষত দেখে মানুষের ভয় পাবার কথা। কিন্তু ব্লাডসাকার বিটলরা সেই ক্ষত দেখে ভয় পায় নি, সেই ক্ষত তাদের আকৃষ্ট করেছিল।

ডঃ মাইকেলের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। রক্তচোষার দল তাঁর রক্ত চুষে চুষে খাচ্ছিল, মাংস খাচ্ছিল কুরে কুরে। কোনো যন্ত্রণা অনুভব করবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর সারা দেহটাই অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

জেনিফার উইল্‌কিনস আগেই মারা গিয়েছিল। নইলে সেই কুৎসিত দর্শন রক্তচোষার ঝাঁক দেখেই তার মৃত্যু হ'ত।

প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে পোকাগুলো মরে নি, ওরা মরে না। তবে প্লেনের মধ্যে যে পোকাগুলো ছিল তাদের কিছু খাবার প্রয়োজন

হয়েছিল। শীত তাদের কাবু করতে পারে না। পরিবেশ অনুযায়ী কীট তার দেহের তাপ সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করতে পারে, কমাতে বা বাড়াতে পারে তবে অবস্থাটা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। গ্রীষ্মে যদিও নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে, শীতে সেটা বেশিক্ষণ পারে না। তখন তারা উষ্ণতা খোঁজে, নিজেকে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে।

সকল প্রাণিই চায় বেঁচে থাকতে। এটা তো স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আহার ও তাপেব সন্ধানে সেই ব্লাডসাকার বিটলের দল অভিযান আরম্ভ করল। মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারলে আহার ও তাপ, উভয় ব্যবস্থাই হবে।

সেই রক্তচোষার দল, তাদের চিন্তাশক্তি আছে কি না তা জানা নেই তথাপি ধরে নেওয়া যাক তারা মানুষের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুষতে চুষতে তারা চিন্তা কবতে লাগল এই প্রচণ্ড শীত থেকে নিজেদের ডিমগুলো কি করে বাঁচাবে? তারপর ডিম ফুটে শুককীট বেরোলে, সেই শুককীট থেকে বাচ্চা বেরোলে বাঁচবে কি করে?

রক্তচোষা পোকাগুলো মৃত মানুষদের রক্ত ও মাংস খেতে খেতে বুঝল, এই মানুষ বা অন্যান্য মৃত জীবই হল তাদের বংশধরদের বাঁচিয়ে রাখার উত্তম আশ্রয়। তাবা এই সব মৃতদেহে এবং মৃতদেহের অন্ত্রে ডিম পাড়বে। ডিম ফুটে বেরোবে শুককীট, লারভা। সেই লারভারা মানুষ বা অন্য জীবের দেহ থেকেই নিজের আহার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকবে। অন্ত্রের ভেতর প্রচুর আহার আছে এবং বাইরের মতো অত ঠাণ্ডাও নয়।

ব্লাডসাকার বিটল্-এর ঝাঁক নিশ্চিন্ত মনে রক্ত চুষে পান করতে লাগল। কুরে কুরে মাংস খেতে লাগল। ডিমও পাড়তে লাগল। ক্রমশঃ তারা শরীরের ভেতরে সর্বত্র প্রবেশ করতে থাকল। প্রচুর আহার, প্রচুর আশ্রয়।

অন্য জীবের দেহের ভেতরে ডিম পাড়লেও মানুষের দেহের ভেতরে

এই রক্তচোষার ঝাঁক কখনও ডিম পাড়ে নি। এই প্রথম। ডঃ ডেভিড মাইকেল, জেনিফার উইলকিনস, ব্রিটিশ সংবাদপত্রের রিপোর্টার এবং আরও অনেকের দেহে তারা ডিম পাড়তে লাগল।

আগামী বসন্ত ঋতু পর্যন্ত ডিমগুলি মানুষের দেহের ভেতরে থাকবে। আলপস পাহাড়ে বরফ গলে রাস্তা পরিষ্কার হলে, রেসকিউ পার্টি ওপরে উঠবে, মৃতদেহগুলি উদ্ধার করবে। মরা মানুষদের আত্মীয়রা তাদের নিজ নিজ দেশে যথোচিতভাবে কবর দেবে।

তারপর যথাসময়ে কবরের মধ্যে মরা মানুষের দেহের ভেতরে রক্তচোষার দলের বংশবৃদ্ধি হবে। নতুন রক্তচোষারা কবরের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে।

তারপর আরম্ভ হবে বিভীষিকা! হরর যাকে বলে।

ওয়ারেন ওকস ল্যাবরেটরিতে স্পেসিমেন বক্সগুলো একে একে গুনতে লাগল। মোট বারোটা বাক্স। বাক্সগুলোর রং স্টীল গ্রে এবং প্রতিটি বাক্স কাস্টমস-এর কঠোর নির্দেশ অনুসারে সীল করা হয়েছিল। প্রতিটি বাক্স রেকট্যাঙ্গুলার, ঢাকনাগুলো বেশ মজবুত করে বসানো। প্রত্যেক বাক্সে দু'টো করে মজবুত তালা লাগানো আছে। তালার ওপর কাস্টমস বিভাগ সীল করে দিয়েছে।

কোমরে দু হাত তুলে ওয়ারেন ওকস বাক্সগুলো আরও একবার ভাল করে দেখল। তারপর টেবিলের ওপর থেকে একখানা হলদে কাগজ তুলে নিল। কাগজখানায় লেখা আছে—

কন্টেন্টস-ডেড অ্যানিম্যালস, ইনসেক্টস। ভেরিয়স টাইপস।

অর্থাৎ বাক্সগুলির ভেতর বিভিন্ন ধরনের মৃত পোকামাকড় আছে। না বোঝার কিছু নেই। যারা সযত্নে এই সব পোকামাকড় সংগ্রহ করেছিল আজ তারা ঐ পোকামাকড়গুলোর মতোই মৃত। তাদের কথা মনে করেই ওয়ারেন মনে মনে দুঃখ অনুভব করতে লাগল।

ওয়ারেন ওকস একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে, একগোছা চাবি তুলে নিয়ে প্রথম বাক্সটার দিকে এগিয়ে গেল। আগে বাক্সটা একবার ভাল করে দেখে নিল। তারপর সীল ভেঙে চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলল। তালা খুলতে বেশ জোর লাগল।

পোকাগুলো তো মরেই গেছে। পাহাড়ের খাদে ফেলে দিয়ে এলেই তো হ'ত। পয়সা খরচ করে এতদূর বয়ে আনার কি দরকার ছিল? বয়ে যদি আনা হল তাহলে সেগুলো আবার ডিসেকসন করে দেখবার ও রিপোর্ট দেবার কি প্রয়োজন? কি লাভ হবে কে জানে?

ওয়ারেন একে একে সব বাক্সগুলোর তালা খুলল। তারপর একে একে ঢাকনাগুলো খুলতে লাগল। প্রথম বাক্সটায় ছিল একটা খুদে বাঁদর। মরে গেছে কিন্তু তার দৃষ্টিটা এমন এবং ওয়ারেনের দিকে এমন ভাবে চেয়ে রয়েছে, যেন মনে হল ওয়ারেনই তাকে মেরেছে, তার মৃত্যুর জন্য ওয়ারেনই দায়ী।

ওয়ারেন বাঁদরের দৃষ্টি গ্রাহ্য করল না। এমন অভিজ্ঞতা তার অনেকবার হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য কত প্রাণী সে নিজেই হত্যা করেছে এবং তাকেও একদিন মরতে হবে। অতএব চিন্তার কি আছে?

আলপস পাহাড়ে শীতের পর যখন বসন্ত এল, বরফ গলে রাস্তা বেরোল তখন রেসকিউ পার্টি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে মৃতদেহগুলি নিচে নামিয়ে দিয়েছিল, সেই সঙ্গে নামিয়ে এনেছিল স্পেসিমেন বাক্সগুলি।

পাইপার নাভাহো বিমানের ধ্বংসাবশেষ সেখানেই পড়ে রইল। বিমান কম্পানির এঞ্জিনিয়ার ও ফরেনসিক এক্সপার্টরা সেখানে যেয়ে ভগ্নাবশেষ পরীক্ষা করে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্ট করবে। কিন্তু এই দুর্ঘটনায় দু'জন অতি বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিহত হওয়ায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। একজন হলেন ডঃ ডেভিড মাইকেল,

ব্রিটেনের বিজ্ঞানী এবং অপরজন আমেরিকান এনটমোলজিস্ট, মারস উইলকিনস।

ডঃ মাইকেল ও ওয়ারেন ওকস একই সঙ্গে কেমব্রিজে গবেষণা করছিলেন। দু'জনে বন্ধু ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুতে সহকর্মী ও বন্ধুরা ওয়ারেন ওকসকে সমবেদনা জানিয়েছিল। এই দুর্ঘটনার ফলে সকলে মর্মাহত তো হয়েছিলই, বলতে কি হতবাক হয়ে গিয়েছিল। ইনস্টিটিউটের চিফ শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন কারণ ডেভিড মাইকেল তাঁর শুধু ছাত্রই ছিল না, সে ছিল ব্রিটেনের সেরা প্রাণি-বিজ্ঞানী এবং পৃথিবীতে সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানী হিসেবে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

ডঃ মাইকেলের মৃত্যুতে ওয়ারেন ওকস ব্যক্তিগতভাবে শোকে এতদূর অভিভূত হয়েছিল যে, তিনদিন সে কোনো কাজ করতে পারে নি, কারও সঙ্গে কথাও বলে নি। কেমব্রিজের এই ইনস্টিটিউট অফ এনটমোলজিতে ডঃ মাইকেল ছিল তার প্রিয়তম বন্ধু। দু'জনের বন্ধুত্ব সেই ইসকুল জীবন থেকে।

ডঃ মাইকেলের মৃত্যুতে খবর শুনে ওয়ারেন ওকস এতদূর চমকে উঠেছিল যে তার হাত থেকে একটা কাঁচের স্লাইড পড়ে গিয়েছিল। ওয়ার্ল্ড একোলজি কনফারেন্সে ডঃ মাইকেলের সঙ্গে তারও তো যাবার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে জার্নি বাতিল করতে হয়। যদি রোমে যেত তাহলে কি সেও নিহত হত? খুব বেঁচে গেছে কিন্তু বন্ধুর মৃত্যু সে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে নি। শোকও সামলিয়ে উঠতে পারে নি, তাই আজকাল ইনস্টিটিউটের কাজ শেষ করে সুরা পান করতে পাবে যায়। তারপর সেখানে থেকে বেরিয়ে কোন জায়গায় একটা কলগার্লের সঙ্গে সময় কাটায়।

এ ছাড়াও সে আর একটা মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিল। রোম যাত্রা শেষ মুহূর্তে সে কেন বাতিল করল? ডঃ মাইকেলকে সে যে যুক্তি দিয়েছিল সে যুক্তি ডঃ মাইকেল সরল মনে বিশ্বাস করেছিলেন

কিন্তু ওয়ারেনের অন্য মতলব ছিল।

গোড়া থেকেই ওয়ারেনের যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মাইকেলকে বলে আসছিল সে তার সঙ্গে রোমে যাবে এবং কনফারেন্স শেষ হলে সে একবার অস্ট্রিয়া যাবে ও ফেরার পথে কয়েকদিন প্যারিসে কাটিয়ে আসবে।

রোমে যাবার দিন সকালে ডঃ মাইকেল স্লাইড ক্যাবিনেট খুলে কয়েকটা স্লাইড তুলে নিচ্ছিলেন, এগুলো তিনি রোমে কয়েকজন বিজ্ঞানীকে দেখাবেন।

ওয়ারেন বলল, আমাদের কনফারেন্সে যেয়ে ঢাক-ঢোল পেটাবার দরকারটা কি?

কি বল তুমি ওয়ারেন? দরকার নেই? আমরা যা করছি তা জনসাধারণকে জানাতে হবে না?

শুধু শুধু সময় নষ্ট। সে সময়টা ইনস্টিটিউটে বসে কাজ করলে অনেক সময় বাঁচবে। আর আমরা যা করছি তা জানাবার জন্যে প্রেস কানফারেন্স ডাকলেই তো হয়।

মাইকেল উত্তর দিলেন না, মনে মনে খুব বিরক্ত হলেন। কিন্তু ওয়ারেন জানে কোনো কাজে বাধা পেলে সে কাজটা করবার জন্যে মাইকেলের জেদ আরও বেড়ে যায়, তাই মাইকেল যাতে নিশ্চয় রোমে যায় সেই জন্যেই সে তাকে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছিল।

মাইকেল বলল, তুমি যাই বল ওয়ারেন আমি রোম যাচ্ছি···

কিন্তু ভাই মাইকেল, আমার তো রোম যাওয়া হচ্ছে না।

সে কি হে! এই শেষ মুহূর্তে তুমি বললে?

কি করব, এইমাত্র মানে ইনস্টিটিউটে আসবার আগে ইণ্ডিয়া থেকে টেলিগ্রাম পেলুম যে, আমার বোন অ্যালিস তার অ্যামেরিকান স্বামীর সঙ্গে ইণ্ডিয়া থেকে এখানে আসছে। কি করি বল ভাই, প্রায় তিন বছর পরে বোনের সঙ্গে দেখা হবে, যাই কি করে।

ওয়ারেন ওকসের মতলব ছিল অন্যরকম। সেই কাজটা সে

মাইকেলের অনুপস্থিতিতে করতে চায়। কাজটা করার কৃতিত্ব সে একাই দাবি করতে চায়।

ডঃ মাইকেল কিছু বলেন নি। তিনি একাই রোমে গিয়েছিলেন এবং আর ফিরে আসেন নি।

আজ এই ঘটনা মনে করে ওয়ারেন মনে মনে কষ্ট অনুভব করছিল। হাজার হক মাইকেল তো তার বাল্যবন্ধু।

সুইটজারল্যাণ্ড থেকে স্পেসিমেন বাক্সগুলো খুলতে ওয়ারেনের মনে পড়ছিল পূর্বস্মৃতি বিশেষ করে শেষ দিনটি। মাইকেল ইনস্টিটিউট থেকে যাবার আগে তার সঙ্গে একটাও কথা বলে নি। এমন কি গুড বাই-ও জানায় নি।

মাইকেল কি কিছু সন্দেহ করেছিল? রোম থেকে মাইকেল ফিরে এলে হয়তো উত্তর পাওয়া যেত কিন্তু ওয়ারেন ওকস কোনদিনই সে উত্তর পাবে না।

যা হয়ে গেছে তা গেছে। পুরনো কথা ভেবে আর কি হবে?

এই মনে করে ওয়ারেন নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিল। তারপর একটা কুইনিন ট্যাবলেট গুঁড়ো করে এক আউন্স ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে মিশিয়ে শরীরটাকে চানকে নিল তারপর সোয়েটার খুলে আস্তিন গুটিয়ে এপ্রনটা পালটে নিয়ে কাজে নামল।

সেই মৃত বাঁদরটা ছাড়া কয়েকটা সাদা ইঁদুর ছিল, কয়েকটা রঙিন বিরল পাখি ছিল কিন্তু সবচেয়ে বেশি ছিল পোকামাকড়। সবগুলোই মরে গেছে। আগে যেভাবে সাজানো হয়েছিল এখন আর সে অবস্থায় নেই। কি করে থাকবে? প্রচণ্ড এক দুর্ঘটনার পর সাজানো অবস্থায় থাকতে পারে না। বাক্সগুলো যে অক্ষত অবস্থায় ফেরত পাওয়া গেছে এই তো যথেষ্ট।

পোকাগুলো স্পেসিমেন জারের তলায় জড়ো হয়ে পড়ে আছে। জায়েণ্ট হারকিউলিস বিটেলের পাশে পড়ে রয়েছে আফ্রিকার প্রেয়িং ম্যানটিস, তার নিচে নাইজেরিয়ার টাইগার বিট্‌ল্। জীবন্ত অবস্থায়

এদের এমন সহাবস্থান কল্পনা করা যায় না।

নাইজেরিয়ার টাইগার-বিট্‌ল্‌ ত বাঘের চেয়েও হিংস্র ধারালো দাঁত দিয়ে যে কোনো নিরামিষ পোকা চোখের নিমেষে খেয়ে ফেলে, চিবিয়ে চিবিয়ে ধুলো করে ফেলে। এদের সঙ্গে কয়েকটা ভারতের সুন্দরবনের মৌমাছিও রয়েছে।

স্পেসিমেন জারের মুখ খুলে সরু লম্বা একটা কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে ওয়ারেন ওকস পোকাগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। পরে এগুলো তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ইনস্টিটিউটের কর্তা সেই রকম অর্ডার দিয়েছেন।

কিন্তু তার আগে পড়ে দেখতে হবে ডেভিড মাইকেলের যে সব নোট বই ও খাতা রেকর্ড করা টেপ, কিছু ফটো ফিল্ম এবং একখানা বড় খাতা। মাইকেল রোমে বেশ কিছু দিন ছিল। এই কয়েকদিনে সে বেশ কিছু কাজও করেছিল, সেসব তার ডায়েরিতে লেখা আছে। কিন্তু শেষ বড় খাতায় মাইকেল কিছু ছবি এঁকেছে, অঙ্ক কষেছে এবং ভাঙা ভাঙা ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় কি লিখেছে তা বুঝতে পারল না। আগে এগুলি সব পড়তে হবে তারপর মৃত নমুনাগুলি পরীক্ষা করতে হবে।

ওয়ারেন সমস্ত স্পেসিমেন বক্সের ঢাকাগুলি আবার বন্ধ করে দিল। তারপর মাইকেলের নোট বই, ডায়েরি, টেপ রেকর্ডার ভিডিও টেপ, খাতা, যা কিছু ছিল গুছিয়ে নিজের অফিস ঘরে চলে গেল।

ডঃ ডেভিড মাইকেল তার বন্ধু ওয়ারেন ওকসের সঙ্গে যুক্তভাবে একটা রিসার্চ করছিলেন এ ছাড়া আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে তিনি আর একটা রিসার্চ করছিলেন। সেই রিসার্চের বিষয় ওয়ারেনের স্পষ্ট কিছু জানা ছিল না, হয়তো মাইকেলের ডায়েরি ও নোটবই থেকে কিছু জানা যেতে পারে।

ল্যাবরেটরির টেবিলে প্যারাফিন ট্রে-তে ওয়ারেন ওকস একটা

র‍্যাবিট ডিসেক্ট করছিল অর্থাৎ একটা বাচ্চা খরগোসকে চিরে দেখছিল তার পেটে কিছু পাওয়া যায় কিনা।

তার পাশে বসে মাইক্রোবায়োলজিস্ট জর্জ ম্যাককেনি মাইক্রোস্কোপে কি দেখছিল। আইপিস থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল:

কি ওয়ারেন কিছু পাচ্ছ? কোনো ব্যাকটিরিয়ার চিহ্ন পেলে আমাকে বলবে।

জর্জ স্কটল্যাণ্ডের লোক। বিভিন্ন রকমের মাইক্রোব সংগ্রহ করা তার কাজ। কত হাজার মাইক্রোব যেন সংগ্রহ করেছে। মাইক্রোবের বেশ বড়সড় একটা লাইব্রেরি করেছে।

ওয়ারেন বলল, এখনও কিছু পাই নি, পেটে রয়েছে কিছু লেটুস আর বাঁধাকপি, সব হজম হয় নি···

কথাগুলো ওয়ারেন যখন বলছিল তখন তার মনে হল কাটা খরগোসের জায়গায় যেন তার বন্ধু ডেভিড মাইকেল শুয়ে রয়েছে। হারকিউলিস বিট্‌ল্ আর টাইগার বিট্‌ল্ তার সারা দেহ যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তার মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ওয়ারেনের মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে এ কি দেখছে? চোখের পাতা পড়ছে না। গলা শুকিয়ে গেছে।

ল্যাবরেটরিতে যারা কাজ করে তাদের মাঝে মাঝে এমন হয়। মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল সেকেণ্ড বা তার চেয়েও কম সময়ের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। তারা ক্ষণিকের জন্যে অজ্ঞান হয়ে যায়।

জর্জ ম্যাককেনি ভাবল ওয়ারেনের বুঝি সেরকম কিছু হয়েছে তাই সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। তাই সে জিজ্ঞাসা করল:

আরে ওয়ারেন তোমার কি হল? অমন করছ কেন?

ওয়ারেন যেন চমকে জেগে উঠে বলল, না, কিছু হয় নি, আর এই দেখ, র‍্যাবিটের স্টম্যাকে এই লেটুস আর ক্যাবেজের সঙ্গে কি রয়েছে।

জর্জ ম্যাককেনি ঝুঁকে পড়ল। ওয়ারেন চিমটে করে কি একটা তুলে তাকে দেখাল, এই দেখ।

আরে এ তো একটা গুবরেপোকা। কি আশ্চর্য! র‍্যাবিট আবার কবে থেকে গুবরে পোকা খেতে শিখল?

শুধু গুবরে পোকা নয়, গুবরে পোকার ডিমও রয়েছে। তাহলে কি বিট্‌ল্‌গুলো র‍্যাবিটের স্টম্যাকে ঢুকে ডিম পেড়ে নিজেরা মরে গেছে?'

তাই আবার হয় নাকি? র‍্যাবিটটা ক্ষিধের জ্বালায় ডিম শুদ্ধ বিট্‌ল্‌গুলো খেয়ে ফেলেছে, জর্জ ম্যাককেনি বলল।

তাই আবার হয় নাকি? র‍্যাবিটের ক্ষিধে পাবার তো কথা নয়, ওর পেটের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যাবেজ, লেটুস এবং কয়েক টুকরো গাজরও রয়েছে অতএব ক্ষিধের তাড়নায় যা পাবে তাই খাবে এমন কি স্বাদবিরুদ্ধ পোকা ও তাদের ডিম খাবে এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।

ওয়ারেন র‍্যাবিটের পেটের ভেতর থেকে যতগুলো পারল গুবরে পোকা আর ডিম চিমটে দিয়ে খুঁজে খুঁজে বার করল। সেগুলো একটা বড় পেট্রি ডিশে জড়ো করতে করতে বলল, গুবরে পোকাগুলো র‍্যাবিটের পেটে যে ভাবে হক ঢুকে পড়েছিল এবং মরবার আগে ডিম পেড়েছে।

জর্জ ম্যাককেনি সায় দিয়ে বলল, তা হতে পারে।

তাহলে এই র‍্যাবিট নিয়ে কি করব?

কি আর করবে? ফেলে দাও নয়তো ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে দাও, এই নাও এই প্লাস্টিক থলেটার মধ্যে সব কিছু ফেলে দাও মায় ঐ পোকা আর ডিম সব কিছু, ওসব রেখে আমাদের কিছু লাভ নেই।

এরপর বাকি দিনটা ধরে ওয়ারেন অনেকগুলো ছোট প্রাণী আর পোকা কেটে কুটে দেখল, প্রয়োজনবোধে ছবি এঁকে রাখল, কিছু নোট করল, কয়েকটা ফরমালিনে ডুবিয়েও রেখে দিল।

বাকি ছিল লম্বা লেজওয়ালা ছোট একটা বাঁদর। এই বাঁদরটারও

পেট চিরে একই জাতের গুবরে পোকা আর অনেক ডিম পাওয়া গেল।

ওয়ারেন বলল, বাঁদরটারও কি অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে? এ ব্যাটাও কি ক্ষিধের জ্বালায় একগাদা গুবরে পোকা গিলেছে?

গুলি মার তোমার গুবরে পোকায়, সব পুড়িয়ে ফেল, নাও ল্যাবরেটরি বয়কে ডাক, সব সাফ করে ফেল বিকেল হয়ে গেছে, এখন চল একটু বেরোন যাক।

যাক আমারও আজ কাজ শেষ, কিন্তু মাইকেল এগুলো রোম থেকে ফিরিয়ে আনছিল? এগুলো তো নিয়ে গিয়েছিল রোমে বিজ্ঞানীদের দেখাবার জন্যে। দেখানো নিশ্চয় হয়েছে তবে আর মিছিমিছি বয়ে আনছিল কেন? আমি তো যতদূর জানি এই মাংকি, র‍্যাবিট, ফেরেট বা গিনিপিগ এগুলো মাইকেল নিয়ে যায় নি, মাইকেল সঙ্গে নিয়েছিল শুধু ইনসেক্ট, এগুলো অন্য কোনো বিজ্ঞানীর বোধহয় অ্যামেরিকান এনটমোলজিস্ট মরিস উইলকিনসের।

জর্জ ম্যাককেনি জিজ্ঞাসা করল, ডঃ মাইকেলের ডায়েরি আর নোট পড়ে কিছু পেয়েছ?

রোমে তো প্রায় কিছুই লেখেই নি। একটা খাতায় কিছু স্কেচ নোট আর কয়েকটা চার্ট, সেগুলো কি বিষয়ে খতিয়ে দেখতে হবে তবে আমার মনে হচ্ছে ওগুলো স্ট্যাগ আর গ্রাউণ্ড বিটল সম্বন্ধে।

আমি একটু দেখি, বলে জর্জ ওর হাত থেকে খাতাখানা নিয়ে পড়তে লাগল। একটা পাতা উলটে বলল,

এই দেখ ওয়ারেন, এখানে মার্জিনে মাইকেল নোট করেছে, শস্যের ক্ষতি করে এমন কতকগুলো পোকার ওপর পেস্টিসাইড অর্থাৎ কীট-নাশক ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে পোকাগুলো কয়েক পুরুষের মধ্যে নিজেদের দেহে একরকম প্রতিরোধক রসায়ন সৃষ্টি করে ফেলেছে যার ফলে কীটনাশক কাজ করছে না। তারপর আরও ছোট অক্ষরে লিখেছে এ বিষয়ে তুরিনের এনটমোলজিস্ট প্রফেসর ফ্রাঞ্চিনির সঙ্গে আলোচনা করেছে।

তাই নাকি? আমাকে মাইকেল বলেছিল বটে যে রোমে যেয়ে সে প্রফেসর ফ্রাঞ্চিনির সঙ্গে আলোচনা করবে।

জর্জ বলল, তা তুমি কি ঐ হারকিউলিস বিটল আর ওদের ডিম, সবগুলো ফেলে দিলে নাকি?

নাহে, স্পেসিমেন হিসেবে সবই কিছু কিছু প্রিজার্ভ করবার ব্যবস্থা করেছি, আমার ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট এখন সে কাজ করছে। যাকগে, আজ আর থাক্, আমি খুব ক্লান্ত, একটু কিছু ড্রিংক না করলে চলছে না, মাইকেলের কাগজপত্রগুলো পরে ভাল করে পড়া যাবে এখন।

তাহলে আমি চলি, ফ্যানি আমার জন্যে ওয়েট করবে, কি সব সপিং করবে নাকি, জর্জ বলল। ফ্যানি তার বৌ।

আরে একটু হুইস্কি খেয়ে যাও। ওয়ারেনের অনুরোধে জর্জ ফিরে এল। দু'জনে হুইস্কি শেষ করল। জর্জ চলে গেল। ওয়ারেন গরম জলে স্নান সেরে নতুন এক প্রস্থ পোশাক পরে তার এক বান্ধবীর বাড়ি যেয়ে হাজির। বান্ধবীকে নিয়ে একটু এদিক ওদিক বেড়িয়ে একটা ইণ্ডিয়ান রেস্তরাঁয় ঢুকে কিছু আহার ও ড্রিংক করে বান্ধবীর বাড়িতেই ঢুকল। রাত্রিটা ওর কাছেই থাকবে।

বান্ধবীকে জড়িয়ে শুয়ে আছে, তার কোমলতা ও উষ্ণতা অনুভব করছে কিন্তু মাঝে মাঝে মাইকেলের সেই দৃশ্যটা তার মনে পড়ছে যে দৃশ্যটা ল্যাবরেটরিতে র‍্যাবিট কাটবার সময় তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আরও একটা চিন্তা তার মাথায় মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে আসছিল। হারকিউলিস বিট্‌ল্ আর তাদের ডিম র‍্যাবিট আর বাঁদরের পেটে কি করে ঢুকল? ভেরি অড, অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার! কি করে হল? তারপর ভাবল প্রাকৃতিক অনেক ঘটনাই তো ঘটে যার কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না, এও হয়তো সেরকম কিছু হবে। তারপর একসময়ে বান্ধবীকে বুকে তুলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মেয়েটির নাম কনি পার্কার। ওয়ারেনের বান্ধবী ঠিকই কিন্তু সে কেমব্রিজ ইউনিভারসিটিতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্টে সেক্রেটারির চাকরি করে।

র‍্যাবিট বা বাঁদরের পেটে হারকিউলিস বিটল্ কি করে ঢুকল তা তো ওয়ারেন স্রেফ ভুলে গেল। বুকের ওপর যদি মাখনের মতো কোমলদেহী সুন্দরী কনি শুয়ে থাকে তাহলে গুবরে পোকার কথা কি কোনো যুবকের মনে পড়তে পারে? সমস্ত ব্যাপারটাই সে ভুলে গেল।

ওয়ারেন ওকস যদি ব্যাপারটাকে উড়িয়ে না দিয়ে ল্যাবরেটরিতেই আর একটু গুরুত্ব দিত, আর পাঁচজন বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করত, র‍্যাবিট ও মাংকির পেটে কি করে হারকিউলিস বিটল্ আসতে পারে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করত তাহলে ঘটনা হয়তো অন্যরকম ঘটতে পারত।

পরদিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন দেখল কনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল, নগ্ন। কনি দেখল ওয়ারেন তার দিকে পিট পিট করে চাইছে। হেসে ফেলল কনি, জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ? আমাকে কি কখনও এ অবস্থায় আর দেখনি? শোনো বাইরে রোদ উঠেছে, আমি ছাদে যাচ্ছি, পনেরো মিনিট সানবাথ করে আসছি, তুমি ততক্ষণ বাথরুম থেকে ঘুরে এস। এখানেই ব্রেকফাস্ট করবে।

তুমি কি এই অবস্থায় ছাদে যাবে নাকি?

অবাক হয়ে কনি বলল, হোয়াই দেয়ারস নাথিং রং ইন ইট, আমি তো প্রায়ই এইরকম হয়ে ছাদে যাই।

কনি আর দাঁড়াল না, দরজা খুলে ছাদে চলে গেল। ওয়ারেন বাথরুমে চলে গেল।

ব্রেকফাস্ট সেরে একটা ট্যাকসি নিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল। কনিকে ইউনিভারসিটিতে নামিয়ে দিয়ে তাকে আলতাভাবে চুমু খেয়ে ওয়ারেন বলল, আমি শিগগির তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। কনি তা জানে, সে হেসে হাত নেড়ে কোমর ঘুরিয়ে চলে গেল।

অফিসের দিকে যেতে যেতে কনি ভাবল ওয়ারেন আবার তাকে

ফোন করবে ঠিকই কিন্তু তার আগে দু'একটা মেয়েকেও ফোন করবে, তাদের সঙ্গে রাত্রি কাটাবে। এ সকলেই জানে। তারা জানে ওয়ারেনের স্বভাব এই রকমই তবে সে বদ লোক নয়। যেদিন খুব পরিশ্রম হয়, সেদিন সে দেহ ও মন চানকে নেবার জন্যে কোনো মেয়ের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে।

ওয়ারেনের বয়স এখন একত্রিশ, ব্রিটেনের একজন উদীয়মান বিজ্ঞানী, যুবতীর প্রতি আসক্তি আছে ঠিকই কিন্তু দুশ্চরিত্র নয়। ওটা তার আর একটা জীবন। সে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করবে না। আরও দু-তিন বছর যাক, তারপর বিয়ে থা করে সংসার পাতবে।

ওয়ারেন জানে সে সুপুরুষ নয় তবে বেশ বলিষ্ঠ এবং তার বোধহয় একটা আকর্ষণী শক্তিও আছে নইলে আজ পর্যন্ত অবিবাহিতা বা বিবাহিতা কোনো নারী তাকে প্রত্যাখ্যান করে নি।

একজন বিবাহিত মহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ওরারেন তুমি বিয়ে করছ না কেন?

মহিলাকে একটি সিগারেট দিয়ে এবং নিজেও একটা সিগারেট ধরিয়ে মুচকি হেসে ওয়ারেন বলেছিল, বিয়ে তো আমি করেছি, অবিশ্যি কোনো মেয়েকে নয়, আমার কাজকে, কিন্তু শোনো আপাততঃ আমাকে কেউ বিয়ে করবে না কারণ সকলেই আমার স্বভাবের কথা জানে এবং এখন আমি বিয়ে করলেও স্বভাব এখন ছাড়তে পারব না। হয়তো বিয়ের এক সপ্তাহ পরেই তোমার কাছে একটা রাত্রি চাইব।

চাইলে আমি তোমাকে আমি ফিরিয়ে দোব না কিন্তু···

আমি ঠিক তিন বছর পরে বিয়ে করব তখন আমার এইসব তাড়না চলে যাবে, বিয়ে করে বৌকে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে পারব, আজ রাতে তুমি ফ্রি আছ?

না, ওর আজ মর্নিং ডিউটি, রাত্রে বাড়ি থাকবে।

এই হল ওয়ারেনের প্রকৃতি।

কনিকে ইউনিভারসিটিতে নামিয়ে দিয়ে সে ইনস্টিটিউটে এল। ইনস্টিটিউটে ঢুকলে সে অন্য মানুষ। ল্যাবরেটরিতে ঢুকে সে সব মেয়ের কথা ভুলে যায়। নিজের রিসার্চ আর বই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন কি লাঞ্চ করতেও বাইরে যায় না।

ওয়ারেন খুব ভাল ছাত্র ছিল, পরীক্ষায় প্রথম অনেকবার হয়েছে, অনেক মেডেল পেয়েছে। অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ বোট রেসে কয়েকবার প্রতিযোগিতা করেছে, অ্যাথলেটিকসেও অনেক প্রাইজ পেয়েছে। চৌকশ ছেলে সুন্দর কথা বলতে পারে, বক্তৃতা দেয় চমৎকার দুরূহ বিষয় সহজ করে বোঝাতে পারে। মেয়ে মহলেও তার জনপ্রিয়তা প্রচুর, তার খোলামেলা ব্যবহার সকলেই পছন্দ করে।

ইনস্টিটিউট অফ এনটমোলজি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিভাগ নয়, স্বতন্ত্র একটি গবেষণাগার, তবে কেমব্রিজের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। রিসার্চ বিষয়ে উভয়ের সঙ্গে আদান প্রদান আছে, সহযোগিতাও আছে তবুও স্বাধীন সংস্থা।

ইনস্টিটিউট বাড়িখানা ভারী সুন্দর, সাদা ঝকঝকে চারিদিকে বড় বড় সাইকামোর, ওক, অ্যাশ ও অন্যান্য গাছ। বাইরে থেকে তাই বাড়িখানা সহজে নজরে পড়ে না। পরিবেশ শান্ত, কাজ করার সুযোগও প্রচুর। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর, বেশ একটা গ্রাম্য পরিবেশও আছে।

ওয়ারেন ট্যাকসি ছেড়ে দিয়ে মেন বিলডিং-এর দিকে চলল। বেশ ফুরফুরে হাওয়া বইছে, গাছে ফুলের কুঁড়ি এসেছে, পাখিরা লাফালাফি করছে, জীবন্ত ফুলের মতো প্রজাপতির দল উড়ে বেড়াচ্ছে। কনির সঙ্গে গত রাত্রিটা ভালই কেটেছে, ওয়ারেনের মনে বেশ ফুর্তি।

ডানদিকে ক্যান্টিন। দুধ চিনিবিহীন এক জার ব্ল্যাক কফি নিয়ে মেন বিলডিং-এ ঢুকে কারপেটের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে নিজের ল্যাবরেটরির দিকে হেঁটে চলল।

ল্যাবরেটরিতে ঢোকবার জন্যে দরজা খুলে যেই পাপোশে পা

দিয়েছে অমনি মনে হল ঘরের টেবিলে ডেভিড মাইকেল যেন শুয়ে রয়েছে, এক ঝাঁক হারকিউলিস বিটল তার সারা দেহ ঢেকে রয়েছে। সেই একই দৃশ্য, ঠিক কাল যেমন দেখেছিল। মাইকেলের শুধু মুখখানাই দেখা যাচ্ছে, আজ যেন আরও সাদা দেখাচ্ছে, কাগজও বুঝি অত সাদা নয়, ঠোঁট দুটো রক্তিম, মনে হচ্ছে কি যেন বলবে।

আর একটু হলেই ওয়ারেনের হাত থেকে কফির জার পড়ে যেত। মাইকেল এইভাবে তাকে কেন বার বার দেখা দিচ্ছে? পরলোক-টরলোকে সে বিশ্বাস করে না তবুও মাইকেল তাকে কি কিছু বলতে চায়?

এক সেকেণ্ডের মধ্যে ছায়া মিলিয়ে গেল। ওয়ারেন ঘরে ঢুকে গেল। ল্যাবরেটরিতে ঢুকে ওয়ারেন দেখল জর্জ তার আগেই এসে গেছে এবং যথারীতি কাজও আরম্ভ করে দিয়েছে। স্লাইডে কিছু একটা স্পেসিমেন স্টেন করছিল। মুখ না তুলেই বলল,

গুড মর্নিং ওয়ারেন, ডঃ মাইকেলের ডায়েরি আর নোটগুলো পড়লে? নতুন কিছু পেলে?

আরে না, এক লাইনও পড়া হয়নি, আটকে গিয়েছিলুম হে।

বুঝেছি, ব্লণ্ড বা ব্রুনেট?

কোনোটাই না, রেড হেড, ওসব যেতে দাও, কালকের সেই চেরা র‍্যাবিট, মংকি আর গিনিপিগগুলো পোড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা জানো?

হ্যাঁ শুনছিলুম, ল্যাবরেটরির বয়রা বলাবলি করছিল, কেন বল তো? না পোড়ালে কি ভাল হয়? কিছু করবে নাকি?

না তা নয়, ইনসিনারেটর খালি পাওয়া যায় না তো, ল্যাবরেটরি যত পরিষ্কার রাখা যায় ততই ভাল, তাছাড়া ঐ গুবরে পোকাগুলোর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোলে ল্যাবরেটরিতে কাজের অসুবিধে করতে পারে।

ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে কি অসুবিধে যে করতে পারে তা তখন

ওয়ারেন বা জর্জ কল্পনাই করতে পারে নি।

জর্জ বলল, ডঃ মাইকেলের ডায়েরি আর নোটগুলো তোমার দেখা হলে আমাকে একবার দিয়ো তো, আমি একটু পড়ে দেখতে চাই।

বেশ তো তুমি এখনি পড়ে নাও না। আমি বরঞ্চ পরে পড়ব, ওয়ারেন বলল।

জর্জ বলল, অত তাড়া নেই, আমি ইতিমধ্যে পারকিনের নোট-গুলো পড়েছি, ঐ টেবিলে পড়েছিল। ওগুলো কাল রাতে সুইটজার-ল্যাণ্ড থেকে এসেছে, পারকিনের নোটে কিছু নেই।

ওয়ারেন বলল, পারকিনের তো নোট রাখার অভ্যাস নেই, যাক গে আমি এখন একটা নতুন কাজ আরম্ভ করব পরে কথা বলা যাবে এখন, তার আগে দেখি সকালের ডাকে কি চিঠিপত্র এল।

ওয়ারেন নিজের অফিসে এসে দেখল টেবিলের ওপর এক বাণ্ডিল ম্যাগাজিন ও কয়েকখানা চিঠি রয়েছে কিন্তু একখানা আলাদা করে রাখা রয়েছে। চিঠিখানা একটা পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দেওয়া আছে।

ওয়ারেন পেপারওয়েট সরিয়ে চিঠিখানা তুলে নিল। চিঠিখানা লিখেছিলেন ডঃ পিটার ফোর্ড, ইনস্টিটিউটের ডিরেকটর। মৃতদেহগুলি সনাক্ত করতে এবং তাদের ব্যক্তিগত জিনিস ও কাগজপত্রগুলি আনবার জন্যে ডঃ পিটার ফোর্ড সুইটজারল্যাণ্ড গিয়েছিলেন।

চিঠিখানা খাম থেকে বার করে ওয়ারেন পড়ল। লেখা আছে: "সঙ্গে যে নমুনা পাঠান হল সেগুলো তোমার আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে। পি এফ।"

চিঠিখানা নামিয়ে রেখে ওয়ারেন চেয়ারে বসে ডঃ মাইকেলের ডায়েরি ও খাতাগুলো এবার উলটেপালটে দেখল কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই পেল না। অতএব ডায়েরি ও অন্যান্য সব কাগজগুলো সঙ্গে নিয়ে জর্জের কাছে ফিরে এসে বলল, এই নাও, আমি কিছু পেলুম না, দেখ তুমি যদি কিছু পাও।

দেখব এখন, বলল জর্জ, ওহে ওদের ফিউনারেল কখন হবে শুনেছ?

না, কিছু শুনিনি তবে শুনেছি ওদের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এখনও নাকি পাওয়া যায়নি।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট? পোস্টমর্টেম দরকার আছে নাকি?

দরকার আছে বই কি। আইন। অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেলেও পোস্টমর্টেম করতেই হবে, কাটাছেঁড়া করে নতুন কি পাওয়া যাবে তা গভর্নমেণ্টই জানে।

জর্জ ম্যাককেনি কোনো জবাব দিল না। দু'জনেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে দেখা গেল গাঢ় ধূসর রঙের জানালাবিহীন একটা বড় ভ্যান কেমব্রিজের দিকে ছুটে চলেছে। দেখতে ব্ল্যাক মেরিয়া পুলিশ ভ্যানের মতো হলেও আসলে ওটা রেফ্রিজারেটেড অ্যামবুল্যান্স। সামনের সিটে ইউনিফরম পরা দু'জন লোক বসে আছে।

ভ্যানটা আসছে হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে। ভেতরে আছে 'স্পেশাল কনসাইনমেণ্ট'। ভ্যান এখন যাবে কেমব্রিজের অ্যাডেনব্রুকস হসপিটালে।

স্পেশাল কনসাইনমেণ্ট বলতে ভেতরে আছে ছ'ফুট লম্বা স্টীল-গ্রে রঙের মেটাল বক্স। দু'টি কফিন।

আগে ল্যাবরেটরিতে যে স্পেসিমেন বক্সগুলো এসেছিল এই কফিন দু'টোরও তেমনি মজবুত করে ঢাকা বসানো আছে। তালাও লাগানো আছে, দু'দিকে।

এয়ারপোর্টে যা কিছু আসুক কাস্টমসের বিনা অনুমতিতে কিছুই এয়ারপোর্টের বাইরে যাবে না। কফিন যত নামী বা দামী ব্যক্তিরই হক না কেন তাও কাস্টমস পরীক্ষা করে, মৃতদেহ দেখে ছাড়পত্র দিয়েছে। অ্যামবুল্যান্সের লোকেদেরও ফরমে সই করে কফিনের ডেলিভারি নিতে হয়েছে।

অ্যামবুল্যান্সের লোকেরা 'পুয়োর বাস্টার্ডস' বলে কফিন দু'টো ভ্যানে তুলে নিয়ে ফুটবল পুল সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে ভ্যানে উঠে ভ্যান ছেড়ে দিল।

মাঝে মাঝে ওরা পিছনে জালের ভেতর দিয়ে দেখছিল কফিন দু'টো ঠিক আছে তো? পড়ে যায় নি তো? আলপস পাহাড়ে তুষার স্তূপের নিচে মৃতদেহগুলো অবিকৃতই ছিল। শরীরের ভেতরে বা বাইরে কোনো ক্ষতি হয় নি। সবই অবিকৃত ছিল।

অ্যাডেনব্রুকস হাসপাতালের মর্গ বেশ ঠাণ্ডা, এয়ারকুল তবে ফরমালিনের কড়া গন্ধে নাক জ্বালা করে। যারা এই ঘরে কাজ করে তাদের নাকে এই গন্ধ সহ্য হয়ে গেছে।

ঘরে তিনজন লোক রয়েছে। একজন ডাক্তার যিনি লাশ চিরবেন, তাঁর একজন সহকারী এবং আরও একজন। তিনজনেই পুরু সোয়েটারের ওপর সাদা নাইলনের ওভারকোট পরেছে।

মারবেলের লাশকাটা টেবিলে আজ মাত্র দুটো লাশ রয়েছে। লাশ দুটো ঘিরে তিনজনে নানারকম কথা বলছে। একটা বেসিনের কল লিক হয়ে গেছে। টপ টপ করে জল পড়ছে। সেও যেন এই তিনজনের সঙ্গে কথা বলছে।

ডাক্তারবাবুর নাম ডক্টর লি, তাঁর সহকর্মী প্যাথলজিস্টের নাম ডিক ব্রাউন এবং তৃতীয় ব্যক্তি যাদের হাসপাতালের ভাষায় বলা হয় মর্টিসিয়ান, তার নাম পিটার গর্ডন। লাশ চেরবার আগে সে সবকিছু রেডি করে রাখে।

ডিক ব্রাউন জিজ্ঞাসা করল, পিলার সব রেডি করেছ?

উত্তরটা পিটার দিল ডাক্তারকে। বলল, হ্যাঁ ডক্টর লি, আমি সব রেডি করে রেখেছি।

ডাক্তার বলল, গুড, আজ সকালে তো দু'টো বডি তাই না পিটার?

হ্যাঁ, আপাততঃ দু'টো বডি ডক্টর।

ডাক্তার বলল, দু'টো বডিই কিন্তু নামী লোকের, এটা হল বিখ্যাত এনটমোলজিস্ট ডঃ ডেভিড মাইকেল, আর ওটা হল প্রফেসর রোনাল্ড পার্কিনস, দু'জনেই কয়েক মাস আগে আলপসে প্লেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

ডিক ব্রাউন বলল, মানুষও বাড়ছে, প্লেনও বাড়ছে, অ্যাকসিডেন্টও বাড়ছে আমাদের কাজও বাড়ছে, কে জানে কোনদিন হয়তো আমরাই এই লাশকাটা টেবিলে এসে যাব।

দূর! এ কাজ ভাল লাগে না, ডাক্তার বলল, এই কাজটা শেষ করেই আমি বেরিয়ে পড়ব, বৌকে বলা আছে আজ বাইরে লাঞ্চ করব, নদীর ওপারে নতুন একটা রেস্তরাঁ হয়েছে, সেখানে যাব, ডিক তুমি কি কোনোদিন রেস্তরাঁটায় গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, গত শনিবারেই তো গিয়েছিলুম, গার্ল-ফ্রেণ্ডকে নিয়ে গিয়েছিলুম, ওর বার্থডে ছিল তো, বেশ ভাল, আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

ডাক্তার ও ডিক ব্রাউন দুজনেই হাতে গ্লাভস পরে রেডি হল। ইলেকট্রিক করাত চালু করা হল। দুজনেই সতর্ক, আঙুল কেটে না বেরিয়ে যায়। মাথা থেকে কাটা আরম্ভ হল। খানিকটা কাটবার পর ইলেকট্রিক করাত বন্ধ করে দেওয়া হল, তারপর স্কালপেল, কাঁচি ও চিমটে।

রুটিন কাজ। ধাপগুলো পর পর মুখস্থ। চটপট হাত চলতে লাগল।

ডেভিড মাইকেল একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত। শুধু কীটবিদ্যা নয়, নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি। ডিক ব্রাউন বলল,

ডক্টর লি, আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমি ডঃ মাইকেলের ব্রেনটা স্কাল থেকে বার করে ভাল করে দেখতে চাই। এমন সর্ববিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি তো আমাদের দেশে বিরল, তাই আর কি। ডঃ লি অনুমতি দিতেই ডিক ব্রাউন সাবধানে ও সযত্নে ডঃ মাইকেলের

ব্রেনটা বার করে নিল। ব্রেনের ওজন নিয়ে সেটা একটা কাঁচের জারে ফরমালিনে ডুবিয়ে রাখল।

এরপর ওরা থোরাক্স, লাংস হার্ট, কিডনি, প্যানিক্রিয়াস সব একে একে পরীক্ষা করল। পাঁজর ভেঙেছে। একটা হাড় লাংস ফুটো করেছে। প্যান ক্রিয়াসের নিচে একটা ক্ষত দেখা দিল। কিন্তু কোনো গুরুত্ব দিল না। ইনটেসটাইনও দেখল না। দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। তাদের মতে হাইপোথারমিয়ার ফলে বিজ্ঞানী দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া অবশ্য অনেক জখম চিহ্ন আছে। অসল কারণ কিন্তু হাইপোথারমিয়া প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

ডঃ রোনাল্ড পারকিনসের দেহও পোস্টমর্টেম করা হল। তাঁর ঘাড়টা একেবারেই ভেঙে গেছে যার ফলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে আর এদিকে ওদিকে কিছু কেটে ছিঁড়ে গেছে। না, আরও এক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। পিঠে একটা বড় ক্ষত ছিল, ঠিক পেটের উলটো দিকে যেখানে নাড়ি ভুঁড়ি থাকে। ডঃ মাইকেলেরও ঠিক ঐ একই জায়গায় একটা ক্ষত ছিল।

ডঃ লি মন্তব্য করলেন, ব্যাপারটা মজার তো, দুজনেরই একই জায়গায় ক্ষত! ডাক্তার আর মৃত দুজনের নাড়িভুঁড়ি পরীক্ষা করলেন না কারণ এসব ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় না। জানা কথা যে অ্যাকসিডেন্টে ওঁদের মৃত্যু হয়েছে অতএব আইন মাফিক একটা রুটিন অটোপসি করা দরকার, তাই করা হল।

ডঃ লি এখন যাবেন বৌ-এর সঙ্গে দেখা করতে। বৌকে তিনি খুব ভালবাসেন, একটু বেশি রকম। তাড়া আছে। ব্রেন এবং কিছু অংশ যা কেটে বার করা হয়েছিল সেগুলো ফরমালিনে ভাল করে ডুবিয়ে দেহ দুটো সেলাই করে দিলেন। দেহ দুটো কোল্ড স্টোরেজে রাখা হল। ডাক্তার বাবু কাগজপত্র সই করে দিলেন।

ডাক্তার বাবু বিজ্ঞানী দুজনের নাড়িভুঁড়ি পরীক্ষা করেন নি, কারণ প্রয়োজন নেই। যদি পরীক্ষা করতেন তাহলে নিশ্চিয় বিস্মিত হতেন;

ঠিক যেমন বিস্মিত হয়েছিল ওয়ারেন ওকস্, বাঁদর বা র‍্যাবিটের পেটে কি করে গুবরে পোকা এল? এই দুই বিজ্ঞানীর পেটেও মৃত গুবরে পোকা ও তাদের অনেক ডিম ছিল। দুজনেরই পিঠের ক্ষত দিয়ে পোকাগুলো তাঁদের ইণ্টেস্টাইনে ঢুকে ডিম পেড়েছিল। ডিম এখন সেখানে পুষ্ট হচ্ছে, যথাসময়ে বাচ্চা পাড়বে তবে তার আর বেশি দেরি নেই।

প্রায় ঠিক একই সময়ে চিকাগোতে ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেণ্টারে ডঃ মরিস উইলকিনস ও তাঁর স্ত্রী জেনিফার উইলকিনসের দেহ পোস্টমর্টেম করা হচ্ছিল।

অ্যাডেন ব্রুকস হাসপাতালে ডঃ লি বিজ্ঞানী দুজনের পেট চিরে ইণ্টেস্টাইন পরীক্ষা করেন নি কিন্তু আমেরিকায় মেডিক্যাল সেণ্টারের প্যাথোলজিস্ট ডঃ উইলকিনস ও তাঁর স্ত্রীর ইণ্টেস্টাইন পরীক্ষা করে কয়েকটা গুবরে পোকা ও প্রচুর ক্ষুদ্র সাদা ডিম দেখেছিলেন কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করেননি বা সেগুলি বার করে পরীক্ষা করে দেখেননি, কোনো গুরুত্বও আরাপ করেন নি।

ওখানে যদি ডাঃ ওয়ারেন ওকস হাজির থাকত তাহলে নিশ্চয় প্রশ্ন করত, একি? মানুষের পেটেও সেই একই গুবরে পোকা ও তাদের ডিম? বাঁদর বা র‍্যাবিটের পেটে পোকা ও ডিম পাওয়া যেতে পারে কিন্তু একই পোকা মানুষের পেটে কি করে আসবে?

ওয়ারেন ওকস সাধারণ বিজ্ঞানী নয় তাছাড়া সে ছিল ডেভিড মাইকেলের সহযোগী। মাইকেল বা পারকিনের পেটে পোকার অস্তিত্বের বিষয় সে জানত না কিন্তু সেদিন সে যদি ইলিনয়েস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেণ্টারে হাজির থাকত তাহলে সে নিশ্চয় ঐ সব হারকিউলিস বিটল এবং তাদের ডিমগুলি নিয়ে পরীক্ষা করত ফলে এই দুই দেশ যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল সে বিপদ না ঘটতেও পারত।

ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেণ্টারে সেদিন অনেক কর্মী অনুপস্থিত ছিল। প্যাথোলজিস্ট ভিকটর ল সকালে এসে পর্যন্ত একটুও বিশ্রাম পাননি। দুটো লাশ চিরতে হয়েছে, ছাত্রদের কাছে ডেমনস্ট্রেশন দিতে হয়েছে, এছাড়া কিছু কাজ একা করতে হয়েছিল, সহকারী অনুপস্থিত। থাকেন শহর থেকে দূরে। খবর পেয়েছেন যে পথে বাড়ি ফেরেন সে পথে আজ বিরাট জ্যাম। কোথায় কোন স্টেডিয়ামে রাগবি খেলা ছিল। খেলা ভেঙেছে। খেলা দেখে হাজার হাজার দর্শক বাড়ি ফেরায় পথে দারুণ ট্র্যাফিক জ্যাম হয়েছে, অতএব ওঁকে অনেক রাস্তা ঘুরে বাড়ি ফিরতে হবে।

কে এখন গুবরে পোকা ও তাদের ডিম নিয়ে মাথা ঘামায়? রিপোর্ট লিখলেন দুজনেরই দেহের অনেক হাড় ভেঙেছে তার ওপর হাইপোথারমিয়া অর্থাৎ প্রচণ্ড শীতে মৃত্যু হয়েছে। তাঁর কাজ শেষ।

এবার অন্য লোক আসবে, তারা লাশ দুটো ধুয়ে পরিষ্কার করে চাদর দিয়ে মুড়ে কোল্ড স্টোরেজে রেখে দেবে। আণ্ডারটেকাররা এসে লাশ দুটো শহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রিভার সাইড বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে নিয়ে যাবে। সেখানে মৃতদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা আসবে। তাদের উপস্থিতিতে কবর দেওয়া হবে।

প্যাথোলজিস্ট ভিকটর ল বাড়ি ফেরার পথে নিজের গাড়িতে বসে ভাবতে লাগল দুজনেই ত অনেকের সঙ্গে প্লেন এ্যাকসিডেণ্টে মরে পাহাড়ের গায়ে মাস দুয়েক পড়ে ছিল। প্লেনে নাকি কিছু পোকা-মাকড়ের নমুনা ছিল। তা আধার ভেঙে দু'চারটে পোকা ওদের দেহে ঢুকে থাকতে পারে। এতে আবার অবাক হবার কি আছে?

ডাঃ ল প্যাথোলজিস্ট, এনটমোলজিস্ট নন। যদি এনটমোলজিস্ট হতেন তাহলে ব্যাপারটা অবহেলা করতেন না। হারকিউলিস বিট্‌ল্ যে কি সাংঘাতিক তা এনটমোলজিস্টরা জানেন। যদিও এখন পর্যন্ত ইংলণ্ড বা অ্যামেরিকায় হারকিউলিস বিট্‌ল্ পাওয়া যায় না। যে সব দেশে পাওয়া যায় সেখানেও তাদের সংখ্যা কম ও একটা সীমাবদ্ধ

এলাকায় ও মনুষ্যহীন প্রান্তরে মাটির মধ্যে তারা থাকে। তারা কোনো প্রাণীর রক্তের স্বাদ কি রকম তা জানে না।

উপযুক্ত পরিবেশে তারা যে কি সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে তা ডঃ ডেভিড মাইকেল অনুমান করে ওদের নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

অ্যামেরিকার এই মিডওয়েস্ট অঞ্চলটাকে অ্যামেরিকার হার্টল্যাণ্ডও বলা হয়। এখন মার্চ মাসের শেষ। বরফ গলছে। বরফ-গলা জল মাটি শুষে নিচ্ছে। মাটি সরস হচ্ছে। এখানকার জমি খুব উর্বরা। গম, ভুট্টা ফলে প্রচুর। ভেড়া, শুয়োর ও গরুর সংখ্যাও প্রচুর। জনবসতিও প্রচুর। নানারকম কলকারখানা ক্ষেতখামার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মিচিগান হ্রদের ধারে চিকাগো অ্যামেরিকার দ্বিতীয় শহর, আশি লক্ষ মানুষের বাস। চিকাগোর বিমান বন্দরে মিনিটে মিনিটে প্লেন ওঠা-নামা করে, রেল স্টেশন থেকে মিনিটে মিনিটে ট্রেন ছাড়ে, আসে। রাস্তায় বাস ও গাড়ি গুণে শেষ করা যায় না।

এই চিকাগো শহরের এক প্রান্তে ভেজা মাটি খুঁড়ে মরিস উইলকিনস ও জেনিফার উইলকিনসকে কবর দেওয়া হল আর তাদের সঙ্গে কবরস্থ হল এক ধরনের সাংঘাতিক পোকার ডিম যার অস্তিত্ব মার্কিনীরা জানে না।

মার্চ মাস শেষ হবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাপ আরও বাড়বে। মাটির নিচে স্বামী-স্ত্রীর দেহ কফিনের মধ্যে পচতে থাকবে। হারকিউলিস বিট্‌লের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে। তারা পচা মাংস খাবে আর বংশ বৃদ্ধি করবে। যখন খাদ্য ফুরিয়ে যাবে তখন ওরা মাটি ফুঁড়ে ওপরে উঠে খাবারের সন্ধানে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ওরা কোনোদিন মানুষ বা কোনো জন্তুর রক্ত বা মাংস খায় নি। এখন খেতে শিখেছে। নতুন খাদ্য, মুখরোচক।

মাটির ওপরে এসে ওরা উড়তে থাকবে। খাবারের সন্ধানে এধার ওধার যাবে। চিকাগোতে বড় বড় কয়েকটা মিট-প্যাকিং কারখানা.

আছে। কারখানার সঙ্গে পালে পালে মোটা মোটা গরু, ভেড়া ও শুয়োর থাকে। কারখানায় ইলেকট্রিক করাতে সেই সব পশুদের কেটে মাংস টুকরো টুকরো করে কোল্ড স্টোরেজে জমা রাখা হয়। ফ্রিজিং-ভ্যানে বিভিন্ন শহরে চালান দেওয়া হয়, ছোট কৌটোয় ভরেও বাজারে বিক্রির জন্যে পাঠান হয়।

এই মিট-প্যাকিং ফ্যাক্টরির সন্ধান কি হারকিউলিস বিট্‌লরা পাবে না? তাদের ব্লাডসাকিং বিট্‌ল্ নাম কি ব্যর্থ হবে?

সন্ধান তারা পেয়েছিল। দূর থেকেই ওরা রক্তের গন্ধ পেয়েছিল। এবং তারপর যে কাণ্ড ঘটেছিল তার বুঝি তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। কুসংস্কারগ্রস্ত ব্যক্তিরা বলেন, তোমরা আগে সাবধান হও নি কেন? সেদিন আকাশটা কি রকম বিশ্রী লাল হয়েছিল তা কি তোমরা দেখ নি? আকাশের রং যদি অমন বিশ্রী হয়, তাহলে সেটা যে একটা বিপদের পূর্ব লক্ষণ তা কি তোমরা জান না? তোমাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

জীবজন্তুরা বুঝি আসন্ন বিপদের সংকেত পায়। সেদিন মিট-প্যাকিং ফ্যাক্টরীর বিরাট পশুশালার গরু, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি পশুগুলো অহেতুকভাবে ছটফট করেছে।

পশুশালাকে ওরা বলে স্টক ইয়ার্ড। পশুগুলো হল কাঁচামাল। তারপর পশুগুলো টুকরো করে কেটে পশুশালার একধারে যে বিরাট কোল্ড স্টোরেজ আছে সেখানে সেগুলি স্টক করে রাখা হয়, তাই জন্যে ওরা স্টক ইয়ার্ড বলে।

মিট ফ্যাক্টরীর ন-তলা অফিস বিল্ডিংটা স্টক ইয়ার্ডের মাঝখানে অবস্থিত। নিচতলায় সিকিউরিটি রুম ছাড়া সমস্ত অফিস বিল্ডিংটা অন্ধকার। জন ভেভিড ডিউটি দিচ্ছে। ঠোঁটে একটা সিগারেট অভ্যাসবশতঃ ঝুলছে কিন্তু টানছে না, ধোঁয়াও বেরোচ্ছে না। সিগারেট থেকে মাঝে মাঝে তার ইউনিফরমে ঝরে পড়ছে।

জন অনেকক্ষণ জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল। একটা নিশ্বাস

ফেলে জানালা থেকে সরে এসে গরম পারকোলেটর থেকে এক মগ কফি ঢেলে নিল।

গরম কফির মগটা ঠক করে টেবিলের ওপর নামাবার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কফি টেবিলের ওপর পড়ল। 'দূর ছাই', বিরক্ত হয়ে জন বলল। তারপর একটা চেয়ারে ধপ করে বসে কফির মগটা তুলে নিল। জনের বিরক্ত হওয়ার কারণ হল, সে মনে করে এইভাবে কফি পড়ে গেলে বুঝতে হবে শীঘ্র কোনো বিপদ ঘটবে।

এতক্ষণ পরে সে সিগারেটে একটা টান দিল কিন্তু সিগারেটটা নিবে গিয়েছিল। সেটা ফেলে দিল। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে কফির মগে চুমুক দিল। তারপর আয়েস করে সিগারেটে আর একটা টান দিল। এইটে সেদিন সকাল থেকে তার পঁয়ত্রিশতম সিগারেট।

জন ডেভিড এই কারখানায় দশ বছর কাজ করছে। ভাল কর্মী, তার সুনাম আছে। এগারো বছরের একমাত্র ছেলের আদর্শ পিতা। বৌ-এর নাম মার্থা। তাকে আরামে ও মেজাজে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। পনেরো বছর বিয়ে হয়েছে কিন্তু মার্থা সন্তুষ্ট নয়, সে ভাবে তার স্বামী তার কর্তব্য করছে না।

মার্থা একদিন কিছু না জানিয়ে ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে। অনেক ভেবে জন কোনো কারণ খুঁজে পায়নি। ছোট একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে, 'আমি ভালভাবে বাঁচতে চাই। একশ ডলার রেখে সব টাকা নিয়ে চললুম। ধন্যবাদ। মার্থা।'

রাতে বাড়ি ফিরে দেখল ঘর ফাঁকা। ড্রেসিং টেবিলে সেই চিঠি। তারপর থেকে জন কফি ছাড়া আর কিছু খায় নি। অবশ্য সিগারেট টানছে এবং বেশি সংখ্যায়।

জন বেশি কিছু চায়নি, বেশি কিছু আশাও করেনি। সে শুধু চেয়েছিল তাকে যেন তার মতো করে থাকতে দেওয়া হয়। সে সংসারের কর্তব্য করবে কিন্তু তাকে যেন স্বাধীনতা দেওয়া হয়। বৌকে

বলত, চারদিকেই তো গোলমাল, ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি ?

জন একটা রুটিন অনুসরণ করতে অভ্যস্ত হয়েছিল। ঘড়ি ধরে অফিস যাও, ঠিক সময়ে বাড়ি ফেরো, ছেলেকে একটু আদর কর, কিছু খাও, তারপর টেলিভিশন দেখ, সপ্তাহ শেষে ছেলে বৌকে নিয়ে সিনেমা বা চিড়িয়াখানায় যাও। সপ্তাহ শেষে মাইনে এনে বৌ-এর হাতে তুলে দাও। জন ডেভিড আর কিছু চায় নি।

এই রুটিনে জন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং স্থির করেছিল বাকী জীবনটা এইভাবে কাটিয়ে দেবে। বৌও তার এই রুটিন মেনে নেবে। কিন্তু কি হল। সারদিন কাজের শেষে বাড়ি ফেরবার সময় সে অনুভব করছে তার যেন বেশি খিধে পেয়েছে, মার্থা তার ডিনার রেডি রেখেছে, পেটভরে তৃপ্তি করে খাবে।

কোথায় সেই ডিনার ? পরিবর্তে দু' লাইনের এক বিদায় লিপি, 'আমি চললুম'। সব ফাঁকা।

তবুও সে রাত্রে জন একটা চেয়ারে বসে মার্থার জন্যে বসে রইল, ভাবল ঝোঁকের মাথায় চলে গেছে, ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবে। আবার হাসবে, কাঁদবে, ঝগড়া করবে, ছেলেটা আবদার করবে। কিন্তু দরজা খুলে কেউ ঘরের ভেতরে ঢোকে নি।

জনও চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরবেলায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে নিজেই কফি তৈরি করে খেল। সেদিন তার নাইট ডিউটি অতএব দিনের বেলা ছুটি। সারাদিন সে বাড়ি থেকে বেরোল না, কে জানে মার্থা ফিরে আসতেও পারে তো। সে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু মার্থা এল না। অন্ততঃ একটা টেলিফোনও জন আশা করেছিল, তাও এল না।

সন্ধ্যা হতেই জন ডিউটিতে বেরিয়ে পড়ল। অফিসে পৌঁছে শুনল তার সহকর্মী অনুপস্থিত, অসুখ করেছে, আসবে না। বদলি লোক দেওয়া হবে না, তাকে রাত্রে একাই ডিউটি দিতে হবে।

জন কফির কাপে চুমুক দেয়, কফির ঘ্রাণ অনুভব করে আর মার্থা ও ছেলের কথা ভাবে। ঘড়ি দেখল। হ্যাঁ, এইবার তো তার একবার রাউণ্ডে বেরোবার সময় হয়েছে, দেখে আসতে হবে সব ঠিকঠাক আছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, দূর ছাই দেখে কি হবে? আমাকে কেউ দেখে না। রাউণ্ডে যাবার জন্যে তার কোনো উৎসাহ দেখা দিল না।

কফিতে আর একবার চুমুক দিয়ে ভাবল, মার্থার প্রতি তার কি আরও একটু বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল? তার অনেক আশা ছিল। জন কি তার কিছুই পূরণ করে নি? আমি তো মার্থার কাজে সন্তুষ্ট ছিলুম, আমার তো কোনো দাবি ছিল না। মার্থা কেন অল্পে সন্তুষ্ট নয়, কেন সে মানিয়ে নিতে পারল না? ঘড়ি টক টক করে চলতে লাগল।

জন উঠে আবার জানালার ধারে যেয়ে দাঁড়াল। পশুশালা থেকে নানারকম আওয়াজ আসছে, কোনো কোনো পশু ঘেরা বেড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই স্টকইয়ার্ডে এখন মাত্র দশ হাজার পশু আছে কিন্তু এখানে আরও দশ পনের হাজার পশু রাখা যেতে পারে।

জন ঠিক করল এখন সে রাউণ্ড দিতে বেরোবে না। এখানে দশ বছর তো চাকরি করছে, কোনোদিন কোনো গোলমাল হয়নি আর আজ রাত্রে কি তার ব্যতিক্রম হবে?

স্টকইয়ার্ড রক্ষণ ব্যবস্থার এখন উন্নতি হয়েছে। এখন আর দলে দলে গার্ড পাহারা দেয় না, কারণ বাইরের বেড়ায় ৪০০ ভোল্ট ইলেক্ট্রিক কারেণ্ট বইছে, ক্লোজড সারকিট টেলিভিশন আছে, তার সাহায্যে বিশাল স্টকইয়ার্ডের যে কোনো স্থানে মাঝে মাঝেই নজর দেওয়া হয়। তার ওপর আছে চোর ধরবার জন্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্র।

তবুও পরে অনেকে বলেছিল সেদিন রাত্রে অন্ততঃ দুজন গার্ড থাকা উচিত ছিল। কিন্তু কে জানবে যে এমন কড়া ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেদিন রাত্রে এমন সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটবে?

জনের মেজাজ কাল রাত্রি থেকেই ভাল নেই। ডিউটিতে এসে পর্যন্ত একা তার কিছু ভাল লাগছে না। রাউণ্ড দিতেও গেল না। এখন কি করা যায়। টেলিভিসনের সামনে বসল। তখন রাত্রির শেষ প্রোগ্রাম চলছিল। হাসির গল্প ও গানের অনুষ্ঠান চলছিল। কিছুক্ষণ শোনার পর আর ভাল লাগল না। তখন সে ভাবতে বসল, মার্থা না ফিরলে সে কি করবে? বাকি জীবন কাটাবে কি ভাবে।

টেলিভিশন তখনও চালু ছিল। তখন একটা গান হচ্ছিল, সঙ্গে জোরে অর্কেস্ট্রা বাজছিল। তার মনে হল পশুশালায় গরুগুলো বুঝি কাতরস্বরে চিৎকার করছে।

প্রথমে ভেবেছিল ভুল শুনেছে বুঝি। আবার শুনল। এবার স্পষ্ট, কোনো ভুল নেই, বেশ জোরে একটা দুটো গরু নয়, অনেকগুলো গরু ভয় পেয়ে, হাঁক পাড়ছে। এরকম ডাক সে কখনও শোনে নি।

জন এই টেলিভিশন বন্ধ করে পশুশালায় নজর রাখার জন্যে ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন খুলল। অন্ধকার। ভাল দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পশুশালার ভেতর জোর আলোগুলো জ্বালা হয় না। তবুও সেই অল্প আলোয় সে দেখল পশুশালার মাঝে যে কাঁচা রাস্তা আছে সেই রাস্তায় ধুলো উড়ছে। কিছুক্ষণ ধরে দেখল। লংহর্ন জাতের গরুগুলো মাঝে কাঠের বেড়ার দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাই এই ধুলো উড়ছে। ছুটে যাওয়ার কারণ কি?

জনের মেজাজ খারাপ, বৌ পালিয়েছে, পেটে কিছু পড়ে নি; তার ওপর এই ঝামেলা। ভাল লাগে? তবুও ডিউটি করতে হবে, দেখে আসতে তবে গরুগুলো অমন করছে কেন।

জন জ্যাকেটটা পরে নিল, কোমরে রিভলভারটাও গুঁজে নিল তারপর যীশুর নাম স্মরণ করে একটা রাইফেল তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। গরুগুলো সময় সময় ক্ষেপে গিয়ে কাঠের বেড়া ভেঙে ইলেকট্রিক কারেণ্ট দেওয়া তারের বেড়ায় যেয়ে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারার সেগুলোকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। এমন ঘটনা দু

একবার ঘটেছে। কাছে হলে রিভলভার চালায়, দূরে হলে রাইফেল।

বাইরে গার্ডদের জন্যে একটা জীপ রেডি থাকে। জীপ চালিয়ে ঘটনাস্থলের কাছে এসে জীপ থেকে নামল। গরুগুলো ছোটাছুটি করছে। জনের মনে হল কোনো একটা গরু ক্ষেপে যেয়ে এই গোলমালের সৃষ্টি করছে। সেই গরুটা খুঁজে বার করে সেটাকে মেরে ফেলতে হবে।

জন সুইচ টিপে জোর আর্ক ল্যাম্প জ্বালল। জোর আলোয় সব দিক আলোকিত হল। গরুগুলো মাটিতে ক্ষুর ঘসছে। এক একটা গরু মাঝে মাঝে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

জন গেটের বাইরে দাঁড়াল। ভীষণ ধুলো। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে অভ্যাসবশতঃ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরাল। ভেতরে না গেলে সঠিক কারণ বোঝা যাবে না।

কাঠের গেটের খিল খুলে ভেতরে ঢুকে ভেতরে এগিয়ে চলল। ঘটনাস্থলের কাছে যেতে গরুগুলো যেন কিছু শান্ত হল। কিন্তু জন এ কি দেখছে? সিগারেটটা পড়ে গেল, তার চোয়াল শক্ত হল। এ যে অবিশ্বাস্য। এমন তো কখনও এখানে হয় নি।

একটা লংহর্ন গরু মাটিতে পড়ে রয়েছে। চোখ দুটো লাল। অসহায় গরুটা বাঁচবার চেষ্টায় যেন চার পা ছুঁড়ছে। জন দেখল, গরুর পেটে যেন কেউ একটা কম্বল চাপা দিয়ে দিয়েছে, কম্বলটা সচল। কম্বল নয় অবশ্য। প্রথম দৃষ্টিতে তাই মনে হয়েছিল। পিঁপড়ের চাক নাকি?

জন কাছে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে দেখল জন্তুটার পেটের একটা অংশ বুঝি ফেটে যেয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে আর সেই সঙ্গে বইছে রক্তস্রোত। আর সেই কাটা জায়গাটার ওপর অসংখ্য গুবরে পোকা চলে বেড়াচ্ছে।

হা ভগবান! বলে জন দু পা পেছিয়ে আসতে না আসতে একটা

বড় ষাঁড় সিং বাগিয়ে তার দিকে তেড়ে এল। জনের পালাবার কোনো রাস্তা নেই। সে তৎক্ষণাৎ রাইফেল তাক করে ষাঁড়ের কপালে গুলি করল।

ষাঁড়টা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গুলি লাগা ক্ষত দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। কিন্তু জন দেখল আর একটা জায়গা দিয়েও রক্ত বেরোচ্ছে। ষাঁড়টার গলা দিয়ে এবং আগের লংহর্ন গরুর মতো সেই ক্ষতস্থানে হাজার হাজার গুবরে পোকা।

এ যে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ব্যাপার। না, এগুলো ডেঁয়ো পিঁপড়ে নয়। দুটো তীক্ষ্ণ তলোয়ারওয়ালা বড় জাতের একরকম গুবরে পোকা এ তো সাংঘাতিক কাণ্ড! একদল ক্ষতস্থানের ভেতরে ঢুকছে, আর এক দল ক্ষতস্থানের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

এই গুবরে পোকা অপর গরু ও ষাঁড়গুলোকেও আক্রমণ করেছে, পেটে, পিঠে, গলায়। হাজার হাজার গুবরে পোকা। তাদের আক্রমণের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গরুগুলো লাফালাফি করছে।

এ কি সর্বনাশ! আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না। স্বপ্ন দেখছি না তো? এই বাক্য তিনটি হল জন ডেভিডের শেষ কথা।

ভেতরে ঢোকবার সময় জন গেট বন্ধ করে আসতে ভুলে গিয়েছিল। কোনো ষাঁড় বা গরু দেখেছিল গেট খোলা। তারা সেই খোলা গেটের দিকে ছুটল। একটা ষাঁড়ের ধাক্কায় জন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। একটা ষাঁড় তার পিঠে সজোরে লাথি চালাল, ষাঁড়ের ক্ষুরের আঘাতে জনের পিঠ ফেটে গেল। যন্ত্রণায় কাতর জন বুঝি এখনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। কয়েকটা জন্তু তাকে মাড়িয়ে চলে গেল।

কত কথা জনের মনে পড়ছে, বৌ ছেলে, কত না বলা কথা। জন্তুগুলো তাকে মাড়িয়ে চলেছে। জন অজ্ঞান। এখনও এক ঘণ্টা হয় নি, জন ভাবছিল মার্থা ফিরে না এলে বাকি জীবন সে কি করে কাটাবে। এখন সে সকল ভাবনা থেকে মুক্ত।

এই খোয়াড়টায় মাত্র শ দুয়েক গরু ষাঁড় ছিল। খোলা গেট

দিয়ে সেগুলো ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগল। কয়েকটা ইলেকট্রিক তারের বেড়ায় আছড়ে পড়ল। তারে ধাক্কা লাগার ফলে অটোম্যাটিক অ্যালার্ম বেল ঝন ঝন করে বেজে উঠল। জন্তুগুলো সারা স্টকইয়ার্ডের খোলা মাঠে ছড়িয়ে পড়ল।

এই অ্যালার্ম ব্যবস্থা কাছেই একটা থানার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখানে অ্যালার্ম বাজলে সেই থানাতেও অ্যালার্ম বেজে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বাজিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে কয়েকটা জীপ মিট ফ্যাকটরির দিকে ছুটে এল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রথম জীপটা ফ্যাকটরির গেটে পৌঁছে দেখল গেটে তালা বন্ধ। তারা বাইরে থেকেই বুঝতে পারছিল ভেতরে একটা কাণ্ড ঘটছে। জীপ থেকে একজন নেমে রিভলভার দিয়ে গুলি করে গেটের তালা উড়িয়ে দিল।

গেট খুলে জীপ ভেতরে ঢুকে ব্রেক কসে থামল। জন্তুগুলো খেপার মতো ছোটাছুটি করছে, কোনদিকে যাবে ভাবছে। কয়েকটা লংহর্ন তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কয়েকটা হেডলাইট আক্রমণ করবার জন্যে আসতে লাগল। জীপের ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিয়ে জোরে পা দিয়ে অ্যাকসিলারেটর চেপে ধরল। গাড়ি যেন লাফিয়ে উঠল। ছুটে আসা জন্তুগুলো কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

গেট খোলা পেয়ে জন্তুগুলো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরোতে লাগল। ওদিকে তখন আরও দুটো পুলিস জীপ বেশ জোরে এসে পড়েছে। সে দুটো জীপ গেটের ভেতরে ঢুকবে কিন্তু গরু ষাঁড়গুলো যে উন্মত্ত হয়ে ছুটে আসছে, এই বুঝি হুড়মুড় করে জীপকে ধাক্কা দেবে।

জীপ বেশ জোরে আসছে। আগেকার প্রথম জীপটা একটা গরুকে বাঁচাবার জন্যে হঠাৎ ডান দিকে গাড়ি ঘোরালো। গাড়িটা একটা দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারল। তারপর কি হল কে জানে, গাড়িখানা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

পিছনের গাড়ির ড্রাইভার সভয়ে দেখল জীপটা জ্বলছে। সে যে গাড়ি থামিয়ে সাহায্যের জন্যে ছুটে যাবে সে উপায় নেই, কারণ গরু ষাঁড়ের দল বন্যার মতো ছুটে আসছে। জীপ থেকে নামলেই সে জন্তুগুলোর ধাক্কায় মরবে। গরু ষাঁড়ের দল বাইরে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল। তবে খানিক দূর পর্যন্ত ছুটে তাদের গতি কমতে লাগল।

যে সব জন্তু পালাচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকগুলো জন্তু ঐ ভীষণ গুবরে পোকা দ্বারা আক্রান্ত। জন্তুগুলো হয়তো ভাবছে যে দৌড়লেই বুঝি তারা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু তারা জানে না, এইভাবে তারা গুবরে পোকার বংশ চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যে সব গুবরে গুলো তাদের দেহ থেকে ঝরে পড়ছে, সেগুলো জমিতে উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নিয়ে ডিম পাড়বে। ডিমগুলো থেকে অজস্র বাচ্চা বেরিয়ে সারা শহরে তথা দেশে বিভীষিকা সৃষ্টি করবে।

মিট ফ্যাকটরির ভেতরে যে সব গার্ড ও পুলিস এসে পড়েছিল তারা জন্তুগুলোকে থামাবার জন্যে গুলি চালাতে লাগল। কিন্তু বৃথা কয়েকটা জন্তু মরল বেশির ভাগ পালাল।

দুর্ঘটনাও ঘটল। বাইরে অ্যাডলাই স্টিভেনসন এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে মস্তবড় একটা ভ্যান ভীমবেগে ছুটে আসছিল। ভ্যানের মধ্যে ছিল টিনে ভর্তি মাংস। ভ্যানের ড্রাইভার তার হেড লাইটে দেখল একটা লংহর্ন তার গাড়ির হেডলাইটের দিকে ছুটে আসছে। লং হর্নটাকে বাঁচাবার জন্যে গতি না কমিয়ে ড্রাইভার গাড়িটাকে বেঁকালো।

ওদিকে বিপরীত দিক থেকে পাশে গার্লফ্রেণ্ডকে নিয়ে একজন যুবক যে ষাট মাইল স্পিডে একটা স্পোর্টসকার চালিয়ে আসছিল তা ভ্যানের ড্রাইভার লক্ষ্য করে নি।

ভ্যানের তীব্র হেডলাইটে যুবক ও যুবতীর চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, তারা কিছু করবার আগেই ভ্যান ধাক্কা মেরে স্পোর্টসকারটাকে পিশে

ফেলল। দুটো প্রাণ গেল, ভ্যানের ড্রাইভারের চোট লেগেছিল কিন্তু সে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।

মিট ফ্যাক্টরির স্টকইয়ার্ডের এই খবর, জন ডেভিডের মৃত্যু এবং ভ্যান ও স্পোর্টসকারের মর্মান্তিক অ্যাকসিডেন্টের খবর কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল এবং মন্তব্য করা হয়েছিল যে পুলিসের হস্তক্ষেপের ফলে অবস্থা দ্রুত আয়ত্তে আনা গিয়েছিল।

যে জন্তুগুলো পুলিস ও গার্ডদের গুলিতে নিহত হয়েছিল সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জন ডেভিডকেও কবর দেওয়া হয়েছিল। কিছু গুবরে পোকা যে জন্তুগুলোর দেহ থেকে বেরিয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছিল তা কেউ লক্ষ্য করে নি। জন ডেভিডের দেহ থেকেও গুবরেগুলো মাটিতেই আশ্রয় নিয়েছিল। কতকগুলো তার শরীরের ভেতরেই রয়ে গেল। কবরের মধ্যেই শয়তানগুলো বংশ বৃদ্ধি করবে।

কেউ হয়তো সেই শয়তানগুলোকে লক্ষ্য করেছিল কিন্তু কয়েকটা গুবরে মানুষের কি ক্ষতি করতে পারে? চাষের ক্ষেতে, পার্কে, বাগানে, নদীর ধারে তারা অমন কত গুবরে পোকা দেখে তারা তো কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু তাই কি?

রবার্ট বেকের ধারণা পৃথিবীর সবাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। রবার্ট সুদর্শন যুবক, উচ্চশিক্ষিত, রুচি মার্জিত, বয়স তিরিশের কাছাকাছি। সরল মন, সকলের প্রিয়। সকলে বলে বেশ ছেলে।

একসিটার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি পাস করে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে। জিওগ্রাফিতে একজন জুনিয়র লেকচারের পদ পেয়েছে, ডক্টরেটের জন্যে শিগগির থিসিস দাখিল করবে। মনে উচ্চাশা পোষণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে সে প্রায়ই যায়। যাওয়া আসার

ফলে মেন রিডিংরুমের অ্যাসিস্ট্যণ্টা লাইব্রেরিয়ান যুবতী ফেলিসিটি নোভাকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল এবং আলাপ থেকে প্রেম। দুজনে বেশ মনের মিল হয়েছে। বিয়ে করলে আদর্শ দম্পতি হবে।

বব বলেছে সে ডক্টরেট না পাওয়া পর্যন্ত বিয়ে করবে না। ফেলিসিটিও লাইব্রেরিয়ানশিপের আর একটা কি পরীক্ষা দেবে। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিনিয়র লাইব্রেরিয়ানের পদ পাবে এবং এই পদ না পাওয়া পর্যন্ত সেও বিয়ে করবে না।

ক্যাম নদীর ধারে দুজনে প্রায়ই মিলিত হয়। যেদিন ইচ্ছে হয় বোট-হাউস থেকে নৌকো বার করে দুজনে খানিকক্ষণ নৌকো বিহার করে। ইচ্ছে না হলে দুজনে বসে গল্প করে, পরে একটা রেস্তরাঁয় যায়, কিছু খায়, কিছু পান করে তারপর যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

সেদিন বিকেলে নদীর ধারে সেই গাছের তলায় সেই বেঞ্চিতে বসে বব ফেলিসিটির জন্যে অপেক্ষা করছিল। কি যে করে মেয়েটা? লাইব্রেরী থেকে আর বেরোবার নাম নেই। কতবার বলে এলুম দেরি কোরো না, আজ একটু বোটিং করব তা মেয়ের এখনও আসবার নাম নেই। সন্ধ্যা হতে আর কতই বা দেরি আছে? (যদিও তখনও দু ঘণ্টা দেরি আছে) এসবই ষড়যন্ত্র। দূর ছাই।

ইউনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে বব একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। চার-পাঁচ টান দিয়ে ভাল লাগেনি তাই আগুন নিবিয়ে সেটা তুলে রেখেছিল।

এখন সেই আধখানা পোড়া সিগারেটটা পকেট থেকে বার করে ধরাল। একটু আগে ঘড়ি দেখেছিল। ফেলিসিটির আসতে দেরি হচ্ছিল। মনে মনে বিরক্ত। তার ওপর সিগারেট টানা তেমন অভ্যাস নেই। ফেলিসিটির কথা ভাবতে ভাবতে যেই না জোরে টান দেওয়া অমনি কাশি।

কাশতে কাশতে ফেলিসিটির কথা ভুলে সে সাব্যস্ত করল এসব তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আর ঠিক সেই সময়েই ফেলিসিটি এল। কেন?

ফেলিসিটি আর একটু পরে এলে কি ক্ষতি হত ? দেরি তো করেইছিল ? সে যে কাঁচা ধুমপায়ী এটা ফেলিসিটি জেনে ফেলল তো ? এটাও কি ষড়যন্ত্র নয় ?

কি বব কি হল ? জিজ্ঞাসা করতে করতে ফেলিসিটি তার পাশে গা'ঘেঁষে বসল।

ও কিছু নয়, গলায় একটু ধোঁয়া আটকে গিয়েছিল, বব অর্থাৎ রবার্ট হাসবার চেষ্টা করে বলল।

কিছু নয় বই কি ? এত বড় হলে এখনও ঠিক মতো সিগারেট টানতে শিখলে না, দাও আমাকে একটা সিগারেট দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি।

বব ওকে প্যাকেটটা দিল। ফেলিসিটি সিগারেট বার করে ঠোঁটে লাগাতে বব লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলে। আয়েশ করে দুবার ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আস্তে আস্তে টান দেবে, বুঝলে, তাহলে আর কাশতে হবে না।

ঠিক আছে গুরু মশাই, তাই করব, তারপর, একটু নৌকাবিহার হবে নাকি ? আমি সব ঠিক করে রেখেছি।

হবে নাকি মানে ? আমি সেই আশায় আশায় আসছি আর বাবু বলেন নৌকাবিহার হবে নাকি ?

ক্যাম নদীটি ছোট হলে কি হবে, ভারি সুন্দর। দুই ধারে কত রকম গাছ। কত গাছের ডাল জল পর্যন্ত নেমে এসেছে। কত গাছে সুন্দর ফুল ফুটেছে। নদী বয়ে যাচ্ছে কুলু কুলু করে। মাঝে মাঝে পাখি ডাকছে। একটু পরে চাঁদ উঠবে।

দুজনে মুখোমুখি বসেছে। দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে ছপ ছপ। ইউনিভারসিটিতে পড়বার সময় রবার্ট দাঁড় টানা অভ্যাস করেছিল। দুজনেরই খুব ভাল লাগছিল। দিন শেষ হয়ে আসছিল। ফেলিসিটি গান ধরল, দি এণ্ড অফ এ পারফেক্ট ডে।

সময় কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে। নদীর ধারে নৌকো ভেড়াবার ছোট একটা জেটি দেখে বব বলল, কাছেই একটা পাব আছে, চল

কিছু ড্রিংক করে আসি, যাবে?

চল যাই, আমি এই পাবটা জানি, পুরনো স্টাইলের, ভাল ভাল সুরা রাখে, ওঠ তাহলে।

জেটিতে নৌকো ভিড়িয়ে সেটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দুজনে হাত ধরাধরি করে পাবের দিকে এগিয়ে চলল। পাবের বাইরে বাগানে অনেক টেবিল চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে। বেশ ভিড় হয়েছে। সব চেয়ার ভর্তি।

ওরা বাগানে যেয়ে দাঁড়াতে একজন ওয়েটার ওদের জন্যে ভেতর থেকে ভাঁজ করা একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার এনে দিল। ওরা মুখোমুখি বসল। ফেলিসিটির জন্যে ড্রাই ভারমুথ আর বব নিজের জন্যে বিয়ার অর্ডার দিল।

দুজনে কত রকম কথা বলল। ড্রিংক শেষ করতে ওরা অনেকটা সময় নিয়েছিল, বুঝতেই পারে নি। ফেলিসিটিই মনে করিয়ে দিল, কি মশাই ফিরতে হবে না?

বব উঠে দাঁড়িয়ে ফেলিসিটির হাত ধরল। ফেলিসিটি উঠে দাঁড়াল। তারপর ওরা নৌকোর দিকে এগিয়ে চলল। ববের মনে হল তার বান্ধবীর পা টলছে যেন। দূর, তাই কি হয়? ঐটুকু ভারমুথ খেয়ে কেউ মাতাল হয় না।

নৌকোয় খানিকটা যাবার পর ফেলিসিটি বলল, নৌকোটা একটু রাখ তো, আমার শরীর ভাল লাগছে না। বব কিনারে নৌকো থামিয়ে একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলিসিটিকে পাড়ে নিয়ে তুলল।

ফেলিসিটি খানিকটা এগিয়ে যেয়ে বমি করে ফেলল। একটু পরে ববের কাছে এসে বলল, আমার তো এরকম কখনও হয় না। আমি ড্রিংক করে কখনও বমি করি না।

বব বলল, অমন হয়, ও কিছু নয়। চল না এক কাজ করি। ঐ দেখ, একটা গ্রেভইয়ার্ড ওখানে বেশ সুন্দর একটা ঘর আর শেড

আছে, চল সেখানে যেয়ে আমরা বসি। তুমি একটু সুস্থ হলে তারপর ফিরব।

তোমার মতলব ভাল নয়। এই গ্রেভ ইয়ার্ডের ঘরটায় ছেলে-মেয়েরা কেন আসে তা বুঝি আমি জানি না? চল যাচ্ছি, কিন্তু খবরদার কিছু করবার চেষ্টা কোরো না, ভাল হবে না তাহলে, বলে ফেলিসিটি খিল খিল করে হেসে উঠে ববের হাত ধরে টানল।

ছ মাসের ওপর দুজনের আলাপ। ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে বেশ কিন্তু দুজনেই দৈহিক প্রেমে বিশ্বাস করে না। এখনও পরস্পরে চুম্বন বিনিময় হয়নি পর্যন্ত।

গ্রেভইয়ার্ডে ঢুকতে গেলে কাঁটা তারের বেড়া পার হতে হয়। ফেলিসিটিকে ভেতরে ঢোকাবার জন্য বব একটা তার তুলে ধরল কিন্তু তারটা ফসকে গেল, বব সেটা আবার ধরতে যেতেই তারের কাঁটায় আঘাত লেগে তার হাতের চেটো বেশ খানিকটা কেটে গেল।

ঠিক সেই সময়ে ফেলিসিটি একটা পা বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওপরের তারটা ববের হাত ফসকে যেতে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তার পা কেটে গেল। পায়ে কোনো মোজা ছিল না, আর থাকলেই বা কি হত? ফেলিসিটি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, এ কি করলে বব? এই দেখ আমার পা কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল।

তাই বুঝি, এই দেখ আমার হাতটা খানিকটা কেটে গেছে।

আহা রে! তোমার তো দেখছি আমার চেয়েও বেশি কেটে গেছে, চল ঐ শেডে বসে যা হয় করা যাবে।

যেতে যেতে ফিলিসিটি ববের পকেট থেকে তার রুমাল বার করে হাতটা বেঁধে দিল। পরস্পর পরস্পরকে সান্ত্বনা দিল, একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু যেভাবে চিরতরে বেঠিক হয়ে গেল তা তাদের কল্পনার বাইরে।

কবরখানার সেই ঘরে যেতে যেতে ফেলিসিটির পা থেকে রক্ত ফোঁটা ফোঁটা পড়তে লাগল। ঘরে পৌঁছবার একটু আগে সদ্য নির্মিত

একটা কবর ওদের চোখে পড়ল। কবরে নাম লেখা আছে ডঃ ডেভিড মাইকেল, তারপর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তাও উল্লেখ করা আছে এবং সব শেষে একটি লাইন লেখা আছে "মৃত্যু কখনও শীঘ্র আসে কখনও দেরিতে।"

ডেভিড মাইকেল দু'জনেরই পরিচিত। কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দু'জনে বুকে আঙুল দিয়ে ক্রশ চিহ্ন আঁকল। তার পর ওরা ঘরে গিয়ে বসল। ফেলিসিটির পা থেকে বেশ কয়েক ফোঁটা রক্ত কবরের পাশেই কাঁচা মাটিতে পড়ল।

ঘরে যেয়ে ওরা পাশাপাশি বসল। ঘরের দরজা বা জানালা নেই। বেশ খোলামেলা। ফেলিসিটি তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কয়েকটা টিস্যু মানে পাতলা কাগজের রুমাল বার করল তারপর সেই রুমাল দিয়ে পায়ের রক্ত মুছে রুমালগুলো দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। দলাগুলো ডেভিড মাইকেলের কবরের পাশে কাঁচা মাটিতে পড়তে লাগল।

ফেলিসিটির পায়ে গোড়ালির ওপরে বেশ খানিকটা চিরে গেছে তবে গভীর নয়। রব ওর ক্ষতস্থানটা আঙুল দিয়ে টিপে রইল। কিছুক্ষণ টিপে রাখার পর রক্ত বন্ধ হল।

রব বলল, আমি সত্যিই ভারী দুঃখিত। তারটা কিভাবে যে ফসকে গেল বুঝতে পারছি না।

আহা, অত দুঃখ প্রকাশ করতে হবে না, ও অমন কত কাটে, বাড়িতে কিচেন নাইফে কতবার আঙুল কেটে যায়, আমারই তো দোষ। আমার শরীরটা হঠাৎ খারাপ না হলে আমাদের এখানে নামতে হত না, অতএব তোমার হাত বা আমার পা কাটত না। যাক, যা হবার তা হয়েছে, ওসব ভেবে এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা মাটি কোরো না।

কথাগুলো শেষ করে ফেলিসিটি এমনভাবে রবার্টের দিকে চাইল যে রবার্ট মুগ্ধ হয়ে গেল। সে ফেলিসিটির একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের ঠোঁটে ঠেকালো তারপর ফেলিসিটিকে কাছে টেনে নিয়ে তাকে

চুম্বন করতে লাগল।

ওরা দু'জনে ঠোঁট মিলিয়ে এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিল তা বুঝতে পারে নি। ফেলিসিটি হঠাৎ চুম্বন ছিন্ন করে আর্তনাদ করে উঠল। একটা যন্ত্রণা অনুভব করেছে ফেলিসিটি তার ক্ষতস্থানে।

পায়ের দিকে চেয়ে দেখল এক পাল গুবরে পোকা ফেলিসিটির সমস্ত পা ঘিরে ধরেছে। ক্ষতস্থান এবং আশেপাশে শুঁড় ঢুকিয়ে ফেলিসিটির রক্ত পান করেছে।

রক্ত মাখানো দলাপাকানো টিস্যুগুলো পড়েছিল মাইকেল ডেভিডের কবরের পাশে কাঁচা মাটিতে। মাটির নিচে আছে মৃত মাইকেল এবং মৃত মাইকেলের পাকস্থলীতে ছিল সেই সাংঘাতিক হারকিউলিস বিট্‌ল্‌ ও তাদের অসংখ্য ডিম। ডিম ফুটে বাচ্ছা বেরিয়েছে। মাইকেলের দেহের পচা মাংস খেয়ে বড় হয়েছে। কিন্তু সেই পচা মাংস শেষ হয়ে আসছে। তারা কাঁচা রক্তর গন্ধ পেয়ে মাটির ওপরে উঠে এসেছে। টিস্যুর রক্ত আর কতক্ষণ! সে রক্ত শেষ করতে না করতে আরও রক্তের গন্ধ পেয়েছে। সে রক্ত ফেলিসিটির পায়ের। এদের ঘ্রাণশক্তি তীব্র।

বব সভয়ে দেখল ফেলিসিটির সাদা পা এখন কালো হয়ে গেছে এবং দলে দলে আরও পোকা আসছে সার বেঁধে। বব তার হাত দিয়ে ফেলিসিটির পা থেকে পোকাগুলো সরাতে গেল। কিন্তু কত পোকা সরাবে?

ইতিমধ্যে অনেক পোকা ফেলিসিটির পা ও উরু বেয়ে শরীরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ববকেও রেহাই দেয় নি। তার কাটা হাতটাও ছেঁকে ধরেছে। অনেক পোকা ববের গলার ভেতর দিয়ে শরীরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ফেলিসিটির বুকের ভেতরেও অনেক পোকা ঢুকে পড়েছে।

কি ভীষণ ধার ওদের শুঁড়ের! সেই শুঁড় দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ওদের রক্ত চুষছে। ওরা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পোকাগুলোর

হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় দু'জনেই জামাকাপড় প্রায় সব খুলে ফেলে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। যন্ত্রণায় ওরা কাটা কই মাছের মতো ছটফট করতে লাগল।

ওরা দু'জনে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে থাকায় পোকাগুলোরই সুবিধে হল সার বেঁধে আসা পোকার দল এখন সহজে ওদের আক্রমণ করতে পারল। ওদের সারা দেহ ছেঁকে ধরল। বব আর ফেলিসিটি সান্ত্বনা পাবার আশায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

ঐ সাংঘাতিক হারকিউলিস বিটলের সঙ্গে ওরা বেশিক্ষণ যুঝতে পারল না। ওরা বোধহয় বুঝতেও পেরেছিল যে এই শয়তানদের কবল থেকে মুক্তি নেই তাই ওরা দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছিল।

জ্ঞান হারাবার আগে বব কি একবারও ভাবতে পেরেছিল যে এসব তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! ভাবলেই বা কি যায় আসে।

দু'জনেই মানুষের ভাবনা চিন্তার বাইরে চলে যেতে দেরি হয় নি।

জুন মাসে কোনো এক সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই জো কল্ডওয়েল সদ্য ঘুম-ভাঙা তার তিরিশ বছরের বৌ এডনাকে বলল, সুইসাইড ছাড়া আমার আর অন্য কোনো পথ নেই। সুইসাইড আমাকে করতেই হবে।

এডনার সবে ঘুম ভেঙেছে। স্বামীর কথার কোনো গুরুত্বই দিল না। এই সুইসাইডের কথা এডনা গত ছ' বছর ধরে প্রত্যহ শুনে আসছে। তার বয়স এখন পঞ্চাশ; তিরিশ বছর বিয়ে হয়েছে, দুটো ছেলে আছে। তারা চিকাগোতে থাকে না। অন্য দুই শহরে তারা চাকরি করে।

বয়স পঞ্চাশ হলেও এডনা এখনও বুড়ি হয় নি। গড়ন-পেটন বেশ ভালই আছে। এখন স্বামীর পাশেই শোয় তবে এক দোষ, নিরাবরণ না হলে তার ঘুম আসে না।

ঘুম থেকে উঠে ঐ অবস্থাতেই বাথরুমে চলে যায়। স্বামী যেমন রোজ সুইসাইডের কথা বলে, এডনাও তেমনি প্রতিদিন বাথরুম যাবার সময় বলে, তুমি ততক্ষণ দাড়ি কামাও, আমি এখনি এসে তোমার কফি করে দিচ্ছি। তারপর তুমি বাথরুম থেকে এসে দেখবে তোমার ব্রেকফাস্ট রেডি।

ছ' বছর আগে জো যখন সুইসাইডের কথা বলত তখন এডনা ভয় পেত। জিজ্ঞাসা করত, কেন তুমি সুইসাইড করবে, আমাকে কি বিশ্বাস কর না?

জো বলত, আরে তা নয়, আমার ভীষণ কাজ, কারখানায় আমাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেললে।

এডনা হেসে ফেলত, বলত, খাটিয়েই যদি তোমাকে মেরে ফেলে তাহলে আর কষ্ট করে সুইসাইড করতে যাবে কেন?

বাথরুমে ঢুকে দাঁত ব্রাশ করতে করতে এডনা ভাবে জো আজকাল যেন একটা যন্ত্র হয়ে গেছে। ঘড়ি ধরে ঘুম থেকে উঠবে, দাড়ি কামিয়ে স্নান করে ড্রেস করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঘড়ি ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। তারপর ঠিক সময়ে বাড়ি আসবে।

জিনিসপত্তরগুলো ঠিক জায়গায় রেখে কারখানার ড্রেস, জুতো মোজা খুলে বাথরুমে যাবে। বাথরুম থেকে এসে কিছু খাবার আর বিয়ার নিয়ে টেলিভিশনের সামনে বসবে। একসময়ে ডিনার খাবে তারপর আর কিছুক্ষণ টিভি দেখে শুয়ে পড়বে।

অথচ মানুষটা আগে এমন ছিল না। আগে সকালে বাথরুমে গান গাইত, কারখানায় যাবার আগে ওকে চুমো খেয়ে যেত। কারখানা থেকে ফেরবার সময় ওর জন্যে চকোলেট, ফুল বা কোনো ছোটখাটো উপহার আনত। বাচ্চাদের জন্যেও কিছু না কিছু আনত। উপহার ও টাকাপয়সা ওর হাতে দিয়ে চুমো খেত।

তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ওকে ও ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেত। মাঝে মাঝে সিনেমাতেও যেত। কিন্তু এই

পাঁচ ছ' বছর হল মানুষটা যান্ত্রিক হয়ে গেছে।

সেদিনও সকালে এডনা যখন জোকে কফি দিল তখনও জো বলল, সুইসাইড তো আমি এখনি তোমার সমনেই করতে পারি কিন্তু তোমার একটা বিলি-ব্যবস্থা করতে হবে···।

জো যখন এই কথাগুলো বলছিল তখন সে বা এডনা ভাবতেই পারে নি যে পৃথিবীতে আজই জো কল্ডওয়েলের শেষ দিন। সে আর বাড়ি ফিরবে না।

এডনা তাকে তখনি থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, ন্যাকামো রাখ তো, তুমি মরলে আমার ব্যবস্থা আমি ঠিক করব, না খেয়ে মরব না, শোনো আজ ফেরবার সময় তোমার কফি আনবে। এধারের দোকানে তুমি যে কফি খাও সে কফির সাপ্লাই নেই। তোমার মোজা সেলাই করে কেচে শুকিয়ে রেখেছি।

তারপর জো কল্ডওয়েল যথারীতি একসময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অনেক দিন পরে আজ যাবার আগে এডনাকে চুমো খেয়ে গেল। এডনাও জানে না যে এই হল তার স্বামীর শেষ চুম্বন।

জো কল্ডওয়েল সরকারী স্লটার হাউসে চাকরি করে। এখানে সব কাজ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হয়। একটা বন্দুক আছে। সাধারণ শটগান নয়। এই বন্দুকের ট্রিগার টিপলে বন্দুকের নলের ভেতর দিয়ে বুলেটের বদলে একটা লোহার বল বেরিয়ে আসে প্রায় বুলেটের বেগে। বলটা আলগা নয়। সরু একটা রডের সঙ্গে যুক্ত যে রড বন্দুকের নলের ভেতর আটকানো থাকে।

যে পশুটিকে কাটা হবে সেটিকে সামনে দাঁড় করিয়ে বন্দুকের ট্রিগার টিপে ঐ বল দ্বারা ঐ পশুর দুই চোখের মাঝখানে আঘাত করা হয়। আঘাত পেয়ে পশুটি হতচেতন হয়ে যায়। তারপর তাকে অতি ধারালো গোল ইলেকট্রিক করাত দিয়ে কাটা হয়। কাটবার আগে যান্ত্রিক কৌশলে ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কনভেয়ার বেল্টে চৌকো বাক্স বসানো থাকে। নাড়িভুঁড়িগুলো সেই বাক্স দিয়ে

কারখানার অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। নাড়িভুঁড়ি থেকে ক্যাটগাট তৈরি হয় এবং আরও কি সব কাজ হয়।

স্লটার হাউসে এই যে সব যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা আছে সেগুলো তদারক ও মেরামত করা হল জো কল্ডওয়েলের কাজ। জো একজন এঞ্জিনিয়ার। তার মতো ঐ রকম এঞ্জিনিয়ার আরও একজন আছে।

স্লটার হাউসে পৌঁছে দু'কাপ কফি বাদাম আর দুটো সিগারেট খেয়ে জো কারখানাটা একবার ঘুরে দেখে এল সব ঠিকঠাক চলছে কিনা। রাউণ্ড দিয়ে এসে খবরের কাগজ এবং আবার কফি নিয়ে বসল।

এরপর লাঞ্চ। লাঞ্চের পর আর এক দফা রাউণ্ড দেবে। টুকিটাকি মেরামত কাজ চলবে। তারপর টি টাইম। বিরতির পর কাজের হিসেব লেখা। কোথা থেকে কেউ ডেকে পাঠলে সেখানে যাওয়া।

এই তো জো কল্ডওয়েলের কাজ। ভীষণ খাটুনি নাকি। আসল কথা ইদানিং সে মোটা হয়েছে। এখন জুন মাস, বেশ গরম। রাউণ্ড দিতে দিতে হাঁফিয়ে পড়ে, তাই বলে খাটিয়ে আমাকে মেরে ফেলল।

স্লটার হাউসের যন্ত্রগুলো পুরনো হয়ে গেছে। সেগুলো একে একে বদলানো হবে। তখন জো-এর খাটুনি কিছু বাড়বে তবে সেজন্যে সে বাড়তি টাকাও পাবে। জো ঠিক করেছে ঐ টাকাটা পেলে সে এডনাকে কোথাও একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে, ক্যালিফোরনিয়া কিংবা মেকসিকো, যেখানে হোক যাবে।

লাঞ্চ ব্রেক। কাছেই একটা ড্রাগ স্টোরে ও আর তার বন্ধু পিট লাঞ্চ সেরে এল। জো-কে এখনও কয়েকটা রিকুইজিসন ফর্ম ভর্তি করতে হবে। কয়েকটা যন্ত্রের দরকার।

ফর্মগুলো একটা ক্লিপবোর্ডে আটকে জো সবে গুছিয়ে বসেছে আর ঠিক সেই সময়ে ড্রেসিং ডিপার্টমেণ্ট থেকে একজন লোক এল।

ড্রেসিং ডিপার্টমেণ্টে জন্তুর ছাল ছাড়ানো হয়। লোকটি বলল,

এক্সকিউজ মি চিফ, স্লটার হাউসে একটু গোলমাল হয়েছে, একজন জখম হয়েছে।

তাই নাকি ? জো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল দেখি কি হয়েছে।

জো আর সেই লোকটি যখন বেরোচ্ছে সেই সময়ে পিট এসে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চললে জো ?

এই লোকটি খবর দিল স্লটার হাউসে ইলেকট্রিক করাত বুঝি ঠিক কাজ করছে না, করাত যে চালায় তার বুঝি আঙুল কেটে গেছে তাই দেখতে যাচ্ছি।

করাতে মাঝে মাঝে মাংস ও চর্বির টুকরো জমে। করাত চালাবার আগে প্রতিদিন সেই জমা চর্বি ও মাংস ভাল করে পরিষ্কার করা দরকার নইলে করাত ঠিক কাজ করে না।

স্লটার হাউসে এসে জো জিজ্ঞাসা করল, কার আঙুল কেটেছে ?

একজন উত্তর দিল, সে এখন নেই, ডাক্তারের কাছে গেছে।

জো বলল, সে থাকলে জিজ্ঞাসা করতুম গোলমালটা কোথায় ? ঠিক আছে। তোমরা কেউ বলতে পার আজ করাত চালাবার আগে করাত মেসিন সাফ করা হয়েছিল কি না।

নীল ওভারহল পরা একজন মেকানিক বলল, হ্যাঁ, আমি তো রোজ করাত মেসিন সাফ করি, আজও করেছি। করাত তো ঠিকই চলছিল। মাঝখানে কি হল কে জানে, ঠিক চলছে না, স্পিড কমে যাচ্ছে।

চালাও তো দেখি।

মেকানিক করাত চালাল। জো দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর বলল, বন্ধ কর। করাত ঠিক চলছে না, কি একটা আওয়াজও পাচ্ছি। ঠিক আছে আমি দেখছি, তুমি ওখানে দাঁড়াও, বললে মেসিন চালাবে।

মেসিন এখন বন্ধ। করাত যখন চলে, পশু যখন কাটা হয় তখন কিছু রক্ত ছিটকে গোল করাতের কেন্দ্রে জমা হয়। মেসিন পরীক্ষা করতে করতে দেখল করাত চাকার গোড়ায় অনেকগুলো গুবরে পোকা জমে রয়েছে যার জন্যে করাত ঠিক চলছে না।

গুবরে পোকা ইলেকট্রিক করাত বেচাল করেছে শুনে সকলে হেসে উঠল।

জো বলল, হাসবার কি আছে? জান সামান্য একটা ইঁদুর একটা প্ল্যান্ট অচল করে দেয়?

তাই নাকি? কে একজন বলল।

হ্যাঁ মশাই, ডেনভারে একটা সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এঞ্জিনিয়ার তো ধরতেই পারে নি। কিন্তু একজন সাধারণ মেকানিক বলেছিল কোথাও নিশ্চয় একটা ইঁদুর ঢুকে পড়েছে। তার কথা শুনে সবাই প্রথমে হেসে উঠেছিল তারপর সে নিজেই যখন সেই মরা ইঁদুর বার করে আনল এবং প্ল্যান্ট চালু হল তখন সকলের হাসি থেমে গেল।

জো তারপর একটা লম্বা ছুরি নিয়ে গোল করাতের গোড়ায় জমে যাওয়া চর্বি ও মাংস পরিষ্কার করতে লাগল।

এই কারখানায় একটা বিশেষ উপায়ে প্রাণী হত্যা করা হয়। মস্ত হলের মধ্যে বেড়া-ঘেরা একটা চৌকো জায়গা আছে যার নাম স্টানিং পেন্। বাছাই জন্তুদের একে একে এই স্টানিং পেনে-এ আনা হয় তারপর সেই বোল্টগান থেকে লোহার ভারি গুলি দিয়ে তার কপালে আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়।

অজ্ঞান হয়ে জন্তুটা মেঝেতে পড়ে গেলে তার পিছনের পায়ে যান্ত্রিক কপিকলের কাঁটা লাগিয়ে তাকে উঠিয়ে নেওয়া হল। উঠিয়ে নিয়ে তার গলাটা ঐ গোল তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরির সঙ্গে ঠেকিয়ে দেওয়া হল। তারপর সুইচ টিপে সেই করাত চালিয়ে জন্তুটার গলায় রক্তবাহী জুগুলার ভেন কুচ করে এক সেকেণ্ডের মধ্যে কেটে দেওয়া হল।

ফিনকি দিয়ে যে রক্ত বেরোতে লাগল সেই রক্ত অবশ্য ধাতু নির্মিত একটা নালা দিয়ে চালিয়ে এক জায়গায় জমা করা হয়। অবশ্য ততক্ষণে জন্তুকে সেই ছুরির কাছ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে।

জন্তুর দেহ থেকে সমস্ত রক্ত বেরিয়ে গেলে জন্তু মরে যায়। জন্তুকে তখন আর এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মেসিনে তার দেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়।

চামড়া ছাড়ান হয়ে গেলে আর এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নাড়িভুঁড়ি এবং যে সব অংশ মানুষের খাওয়ার অনুপযুক্ত সেইসব অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়। সেইসব নাড়িভুঁড়ি থেকে কিছু অংশ বার করে নেওয়া হয়, সেগুলি অন্য কাজে লাগানো হয়। রক্তও অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রায় সব কিছু কাজে লাগে।

শেষে সেই ছাল ছাড়ানো, রক্তহীন, নাড়িভুঁড়ি বাদ জন্তুকে একটা বড় হলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে টুকরো টুকরো করে সাইজ মতো কেটে কোল্ডরুমে জমা করা হয়।

কোল্ডরুম থেকে কতক মাংস পলিথিনের ব্যাগে প্যাক করে ফ্রিজিং ভ্যানে চাপিয়ে স্থানীয় বাজারে পাঠান হয়, কতক হাওয়া শূন্য টিনে প্যাক করে দূরে চালান দেওয়া হয়। এই কারখানার এই হল কাজ। সব কাজ যন্ত্রেই করা। হাতে কিছু করা হয় না বললেই চলে।

গোলাকার কবাতটার যে ত্রুটি হয়েছিল সেটা হল এই যে করাতটা জন্তুর জুগুলার ভেন পর্যন্ত পৌঁছচ্ছিল না অতএব ভেন ঠিকমতো কাটছিল না। এই ত্রুটি হওয়ার কারণ দেখা গেল করাতের গোড়ায় একগাদা গুবরে পোকা জমেছে। কিছু চর্বি ও রক্ত জমে, সে তো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়।

সেদিন রক্ত ও চর্বি পরিষ্কার করবার পর কিছুক্ষণ করাত চালাবার পরই এই ত্রুটি দেখা গেল। এরকম কোনোদিন হয় না তাই জো-কে খবর দেওয়া হয়েছিল। জো করাত খুলে দেখে এই কাণ্ড। তাই সে একটা সরু ও লম্বা ছুরি ও মাথা বাঁকানো স্টীলের আঁকশি নিয়ে সেই পোকার স্তূপ ও অন্যান্য আবর্জনা পরিষ্কার করতে লাগল।

গোল করাতের গায়ে একটা বুরুশ লাগানো থাকে। চাকার গায়ে যে রক্ত লাগে বুরুশ সেটা সরিয়ে দেয়, যাতে চাকার গায়ে রক্ত জমতে না পারে। কিন্তু বুরুশটায় সব সময়ে কিছু না কিছু রক্ত জমে থাকে। আর রক্তের গন্ধ পেয়েই ব্লাডসাকার রক্তচোষা বিটল্‌গুলো এসেছিল এবং মরে যেয়ে কিছু অন্যত্র ছিটকে পড়েছিল আর কিছু

জমে যাচ্ছিল গোল করাতের দণ্ডে বা অ্যাকসিসে ফলে যা হয়েছিল তার জন্যে জো কল্ডওয়েলকে ডাকতে হয়েছিল।

জো সব সাফ করে করাত লাগিয়ে বলে উঠল, "যাক বাবা বাঁচা গেল।" কিন্তু সেই করাতের যে মেকানিক কাছে দাঁড়িয়েছিল সে ভুল শুনল। সে কিছু জিজ্ঞাসা না করে বা কিছু না দেখে মেসিন চালিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে জো-এর বাঁ হাতখানা উড়ে গেল। চক্ষের নিমেষে কাণ্ডটা ঘটে গেল।

জো যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুনে সেই মেকানিক অনুমান করল নিশ্চয় একটা অঘটন ঘটে গেছে। সে চট করে মেসিনটা বন্ধ করে দিল কিন্তু তখন আর মেসিন বন্ধ করে কি লাভ, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মেসিন বন্ধ করে বেরিয়ে এসে দেখল এই কাণ্ড। জো যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কাটা হাত দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ও এত অকস্মাৎ ঘটে গেল যে জো-এর কাছে যারা ছিল তারা সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। জো-কে যে এখনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার তা যেন সবাই ভুলে গেল।

যখন তাদের চেতনা ফিরে এল তখন দেরি হয়ে গেছে। কোথা থেকে শত শত রক্তচোষা গুবরে পোকা নতুন রক্তের গন্ধ পেয়ে ছুটে এসেছে। তারা জো-কে ছেঁকে ধরল। জো ছুটোছুটি করতে লাগল। মেঝেতে পড়ে যাওয়া নিজেরই রক্তে পা পিছলে পড়ে গেল। তার বন্ধু পিট তাকে ধরে তুলতে এল আর সেই সময়ে জো-এর কাটা হাতের রক্ত পিটের গলায় ও গালে লেগে গেল। পিটকেও রক্তচোষার দল ছেঁকে ধরল।

কোথা থেকে শত শত হাজার হাজার রক্তচোষা পোকার দল এসে সমস্ত স্লটার হাউস ছেঁকে ফেলল। স্লটার হাউসে কাঁচা মাংস, রক্ত, কাটা মুণ্ডু, কাটা খুর, নাড়িভুঁড়ি কিছুরই অভাব নেই। কর্মীদেরও প্যান্ট, ওভার অলের ভেতরে ঢুকে গেল। তাদের তাড়াতে যেয়ে পা

পিছলে সিমেন্টের মেঝেতে পড়ে গেল, একজনের মাথা ফেটে রক্ত বেরোল আর একজনের কিসে লেগে ঘাড় কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ল।

তাদের পোশাকের ভেতর তো আগেই রক্তচোষার পাল ঢুকে পড়েছিল। এখন অন্য কোথা থেকে আর এক ঝাঁক রক্ত চোষা পিল পিল করে কাটা জায়গা আক্রমণ করে ধারালো শুঁড় বিঁধিয়ে রক্ত চুষতে আরম্ভ করল।

সে যে কি কাণ্ড! তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। এমন কাণ্ডকে ইংরেজিতে বলে—'অল হেল ব্রোক লুজ।' চারদিকে ছোটাছুটি, চেঁচামেচি, দারুণ হট্টগোল, একেবারে যাকে বলে প্যাণ্ডিমোনিয়ম।

এত কালচে লাল রঙের এত বড় ও এত দীর্ঘ ধারালো শুঁড়ওয়ালা বিট্‌ল্ এবং রক্ত চোষা, কোথা থেকে এল? এই উৎপাত তো স্লটার হাউসে কোনো দিন ছিল না। মাছি ও পিঁপড়ের উপদ্রব মাঝে মাঝে হয় কি তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত করা যায় এবং তারা তো এমন সংঘাতিক অত্যাচার করে না।

কর্মীদের ওভারঅলে কিছু কাঁচা রক্ত লেগে থাকে এবং সেই কাঁচা রক্ত হল সেই বিট্‌ল্‌দের তীব্র আকর্ষণ। পিটের দেহে কোথাও কাটে নি, জো-এর কাটা হাত থেকে তার ঘাড়ে ও গালে রক্ত লেগেছিল।

শুঁড়ওয়ালা বিট্‌ল্‌গুলো পিটের গালে ও ঘাড়ে রক্তের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইঞ্জেকশনের ছুঁচের মতো শুঁড় বিঁধিয়ে রক্ত চুষতে আরম্ভ করল।

পিট তখন বন্ধুকে বাঁচাবে বা বন্ধুর জন্যে কিছু করবে কি? নিজেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটা দুটো পোকা হয় তাড়ানো যায়, এ যে রক্তবীজের বংশের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে তার ওপর শুঁড় ফোটাবার যন্ত্রণা। ওরা ক্রমশঃ সারা শরীরটা ছেঁকে ধরে রক্ত চুষতে থাকে। রক্ত ক্ষয়ের জন্যেই মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, ক্রমশঃ সংগ্রাম করার শক্তি হারিয়ে ফেলে দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

এই অবস্থাতেই পিট দেখল তাদের একজন সহকর্মী পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে করতে মেঝেতে পড়ে গেল। পড়বার আগে একটা লোহার টেবিলের কোণে তার মাথাটা লেগে ফেটে চৌচির, ঘিলু বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শ'খানেক পোকা তার মাথাটা এমনভাবে ঘিরে ধরল যেন তার মাথায় একটা টুপি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকটি পড়ে যেয়েও মাথায় অমন জোরে আঘাত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তাকে বোধহয় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না।

ইতিমধ্যে জো-এর হাতের অনেকটা অংশ ও পিটের গাল ও একটা চোখ পোকারা কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। সেখান থেকে রক্ত শরীরে যেখানে যেখানে অন্ততঃ একটা ফোঁটাও পড়ছে সেখানেই ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদের হাত থেকে স্লটার হাউসের কারও নিস্তার নেই।

স্লটার হাউসের ভেতর থেকে বেরিয়ে পোকার পাল বাইরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যে জন্তুটার গলার রক্তশিরা পুরো কাটা যায় নি সেই জন্তুটা তখনও কপিকলে ঝুলছিল, তখনও তার দেহে প্রাণ ছিল। তাকেও রক্ত চোষার ঝাঁক রেহাই দেয় নি। একটু জায়গাটাকে পোকার দল কয়েক মিনিটের মধ্যে বেশ বড় করে ফেলল। তার রক্ত চুষতে চুষতে ও দেহ কুরে কুরে এত তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করল যে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বোধহয় জন্তুটার কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু বাকি থাকবে না।

জো আর পিট মেঝেতে পড়ে। প্রথমে তারা হাত পা ছুঁড়ছিল কিন্তু এখন হাত পা ছোঁড়া দূরের কথা চোখের পাতা ফেলবারও ক্ষমতা নেই। তাদের শরীরের রক্ত দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছে। তারা এখন শক্তিহীন নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। দু'জনের তখনও কিছু জ্ঞান ছিল বোধহয়।

জো তার পত্নী ও ছেলেদের কথা ভাবছিল বোধহয়। সে যে

আত্মহত্যা করতে চাইছিল সে কথা কি তার এই সময়ে মনে পড়েছিল ? আর পিট ? না পিটের বোধহয় কোনো জ্ঞানই ছিল না। তার দুটো চোখই পোকার দল আগেই খেয়ে ফেলেছিল।

পুলিস আর অ্যামবুল্যান্স যখন এসে পৌঁছল ততক্ষণে জো, পিট এবং আরও চারজন মারা গেছে। আরও চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, যে কোনো সময় ওরা মারা যাবে। অ্যামবুল্যান্স ওদের হাসপাতালে নিয়ে ক্যাপটেন ডঃ গ্রেহাম ড্যাডসের জিম্মা করে দিল।

ক্যাপটেন ড্যাডস মিলিটারি ডাক্তার। কুড়ি বছরের ওপর তার প্র্যাকটিস কিন্তু তিনি কখনও এরকম রোগী দেখেন নি এবং বিট্‌ল্‌স যে এই কাণ্ড করেছে এমন আজগুবি কথাও তিনি শোনেন নি।

অ্যামবুল্যান্সের কর্মীরা চলে যাবার পর তিনি একজন পুলিস-ম্যানকে জিজ্ঞাসা করলেন : ওরা কি বলে গেল ? তুমি শুনেছ ?

ডঃ ড্যাডস অ্যামবুল্যান্সের কথা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি অথবা তার কথা বিশ্বাস করেন নি। তাই পুলিসম্যানকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

পুলিসম্যান বলল, কেন ? আপনি তো শুনলেন যে বিট্‌ল্‌ এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। আমিও তো সেইখান থেকেই আসছি, আমিও তাই দেখে এসেছি।

দাঁড়াও দাঁড়াও অত তাড়াতাড়ি নয়, না বাবা এমন কথা আমি আগে কখনও শুনি নি। ব্যাপারটা আমাকে যাচাই করতে হবে, শোনা মাত্র কোনো কথা বিশ্বাস করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ।

গবাদি পশু পালন করে এবং বেসরকারী কয়েকটা কসাইখানার মালিকদের তিনি ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের ওখানে কালচে লাল রঙ ও শুঁড়ওয়ালা গুবরে পোকার উৎপাত হয় কিনা বা তারা এমন গুবরে পোকা দেখেছে কিনা ?

তারা বলল, গুবরে পোকা তো নানারকম আছে, অন্য পোকাও

আছে, তারা মাঝে মাঝে উৎপাত করে বটে তবে মানুষ বা জন্তু মেরে ফেলে এমন ঘটনা আমাদের এখানে কখনও ঘটে নি। আমরা সতর্ক থাকি এমন পোকারা উৎপাত করলে তাদের আমরা সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলি। তবে এমন পোকা আছে যা পশুদের ঘা-এর মধ্য দিয়ে শরীরের ভেতর ঢুকে পড়ে রোগ সৃষ্টি করে তাদের মেরে ফেলে। এমন ভাবে দু চারটে পশু মরে তবে ডাক্তার, আপনি যা বলছেন তেমন কথা আমার বাপের জন্মে শুনি নি।

যাক বাঁচা গেল, ব্যাপারটা যাচাই করে নেওয়া গেল। ডাক্তার ড্যাডস নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু যাদের কাছ থেকে উত্তর শুনলেন তাদের তো তখনও রক্তচোষা পোকার সঙ্গে মোলাকাত হয় নি। তবে হ্যাঁ, কিছু বিষাক্ত পোকামাকড়ও আছে। তাদেরই আক্রমণে মানুষ-গুলো মরেছে। দশটা মৃত ব্যক্তির ময়না তদন্ত করে ডাক্তার ড্যাডস সেই রকম রিপোর্ট দিয়েছিলেন।

রিপোর্টের নিচে তিনি যোগ করেছিলেন ঃ কয়েকটা ষাঁড় কোনো বিষাক্ত পোকা অথবা প্যারাসাইটের আক্রমণে রোগাক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কোনোভাবে নিজেদের খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। কসাইখানার কর্মীরা তাদের ধরতে যেয়ে নিজেরা আহত হয়। কিছু বিষাক্ত বা প্যারাসাইট কোনোভাবে ঐ কর্মীদেরও আক্রমণ করে থাকবে যার ফলে এই দশজন মারা গেছে। পশুদের আটকাতে যেয়ে গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু কর্মী অন্য ভাবে জখম হয়েছিল, ইলেকট্রিক করাতে দুর্ঘটনাক্রমে একজনের হাত কাটা গেছে, কারও হয়তো মাথা ফেটেছে যে জন্যে ক্ষতস্থানে বিষাক্ত পোকা ও প্যারাসাইটরা সহজে প্রবেশ করতে পেরেছিল।

নিজের রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবার পর বিকেলে ড্যাডস স্লটার হাউস থেকে যে রিপোর্ট পেলেন তা তিনি বিশ্বাস করলেন না। হাজার হাজার—লাখ লাখ ব্লাডসাকার বিটল? অসম্ভব। একথা বিশ্বাস করতে হবে? তারা গরু মানুষ খেয়ে ফেলেছে! রাবিশ!

কিন্তু আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার পরে চিকাগো শহরে সেই ডাক্তার ড্যাডস সমেত সকলকেই ব্লাডসাকার বিট্‌ল্‌দের কথা বিশ্বাস করতে হয়েছিল, বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না।

ওয়ারেন ওকস বিরক্ত হয়ে টেলিফোন অপারেটরকে বলল: কে কথা বলতে চাইছে? আমি এখন পারব না, আমি ভীষণ ক্লান্ত, এখন বাড়ি যাচ্ছি।

টেলিফোন অপারেটর বলল, আ'ই অ্যাম সরি ডঃ ওকস, সেকথা আমি বলেছি, উনি প্রথমে ইনস্টিটিউটের ডিরেকটরকে চেয়েছিলেন, আমি তাঁকে বলি যে মিঃ পিটার ফোর্ড এখন বাইরে। তখন উনি বলেন তাহলে ডিরেকটরের পরে যে তাঁকে দাও, ব্যাপারটা খুবই জরুরী।

কে কথা বলতে চাইছে? ওকস জিজ্ঞাসা করল।

কেমব্রিজশায়ার পুলিসের চীফ ইনস্পেক্টর কেলি, আপনি তো নেক্সট টু ডিরেকটর তাই লাইনটা আপনাকেই দিতে চাইছি।

বেশ তাহলে লাইন দাও, শুনি কি বলে।

অপারেটর ওকসকে লাইন দিল। ওকস বলল: ডকটর ওকস কথা বলছি।

ওপার থেকে উত্তর হল আমি টমাস এ্যালবার্ট কেলি কথা বলছি, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি, কেমব্রিজশায়ার পুলিস স্টেশনের আমি চীফ ইনস্পেক্টর।

বলুন ইনস্পেক্টর কেলি, আমি শুনছি।

এরপর কয়েক মিনিট ওকস শুধু শুনেই গেল, মাঝে শুধু হুঁ, হ্যাঁ। কেলির কথা শেষ হতে ওকস প্রথম কথা বলল: গুড গড, তারপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনি যা বললেন তা শুনে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন কোনো সায়েন্স ফিকশনের কাহিনী শুনছি, এ

একেবারে অবিশ্বাস্য, হরিবল, অবিশ্যি আপনি নিজে যখন দেখেছেন তখন নিশ্চয় কিছু সত্য আছে তবে এই ধরনের বিট্‌ল্‌ যে কোনো জায়গা বা দেশ থেকে আসতে পারে তবে পোকা মানুষ ভক্ষণ করে না, অ্যাঁ? কি বললেন? হ্যাঁ আমি মর্গে যাব, যে কটা বিট্‌ল্‌ আছে সেগুলো দেখব তবে আমার মনে হয় এটা একটা ব্যতিক্রম, ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।

গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে ওকস ভাবল টেলিফোনে তার সঙ্গে কোনো ছাত্র ঠাট্টা করে নি তো? সে নিজেও তো ছাত্র ছিল, প্রফেসরদের মাঝে মাঝে ওরা বোকা বানাত। ইস্‌ ভুল হয়ে গেল। টেলিফোন নামিয়ে রেখে কেমব্রিজ থানায় একবার ফোন করলেই জানা যেত থানায় কোনো চিফ ইনস্পেক্টর কেলি আছে কিনা এবং সে আমাকে টেলিফোন করেছিল কিনা।

দশ মিনিট পরে তার সন্দেহের নিরসন হল যখন সে সত্য সত্যই হাসপাতালের মর্গে ইনস্পেক্টর কেলির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। কেলি নিজের নাম বলে বলল যে সে হোমিসাইড অর্থাৎ মার্ডার ডিপার্টমেণ্টের চিফ।

ঠাণ্ডা মর্গের ভেতর দিয়ে ল্যাবরেটরির দিকে যেতে যেতে কেলি বলল: আপনাদের ফোন করবার আগে নিজেকে বোকা মনে হচ্ছিল, স্বভাবতই আপনারা বিশ্বাস করতে চাইবেন না যে গুবরে পোকা মানুষ খুন করেছে।

আপনি এটা খুন বলতে চাইছেন এবং বলছেন কয়েকটা বিট্‌ল্‌ মানুষ খুন করেছে?

হ্যাঁ, খুন ছাড়া আর কি বলব? আমরা ডেডবডিতে বুলেট চিহ্ন, ছোরার আঘাত বা পাকস্থলীতে বিষও পাই নি শুধু দেখেছি অনেক গুবরে পোকা বডির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, কুরে কুরে অনেক জায়গায় মাংস খেয়ে ফেলেছে। পোকাগুলোই ওদের মৃত্যুর কারণ নাও হতে পারে, আজকাল আমি বড় বেশি সায়েন্স ফিকশন পড়ছি, এ সব

আজগুবি চিন্তা আমার মাথায় ঘুরছে বোধহয়, যাই হক যা বললুম তা আপনিও যেন বিশ্বাস করবেন না।

আচ্ছা ঐ বিট্‌ল্‌ কি কিছু আপনি সংগ্রহ করে রেখেছেন ?

আপনি দেখতে চান ?

হ্যাঁ যখন এসেছি তখন দেখেই যাই।

কেলি যেন দ্বিধাগ্রস্ত হল। একটু ইতস্তত করে বলল, আমি আমার এই অদ্ভুত ধারণার কথা কাউকে বলি নি, যে শুনবে সে হাসবে, আপনিও দয়া করে আমার ধারণার কথা কাউকে বলবেন না যেন।

ঠিক আছে কাউকে বলব না।

ইনস্পেক্টর কেলি ল্যাবরেটরির ফ্রিজ থেকে প্ল্যাস্টিকের ছোট একটা থলে বার করে ডঃ ওকসের হাতে দিল। থলের মধ্যে অনেক-গুলো গুবরে পোকা আছে।

কেলি বলল, দেখুন তো ডকটর এই সব পোকাগুলো আকারে কিছু বড় ঠিকই কিন্তু এরা মাংসাশী কি না।

ওকস পোকাগুলো ল্যাবরেটরির টেবিলের ওপর রেখে পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং লেনস বার করে পোকাগুলো ভাল করে দেখে বলল :

ইনস্পেক্টর কেলি আপনি এই পোকা সম্বন্ধে আপনার ধারণা চেপে ভালই করেছেন। যতদূর দেখতে পাচ্ছি এই পোকাগুলি এদের চেয়ে আকারে ছোট এমন পোকা ধরে খেতে অভ্যস্ত, মানুষ খুন করার শক্তি এদের নেই। আকারে এগুলি এত বড়ই হয়, কোনো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি না, তবে আমি কয়েকটা নমুনা আমার ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে পরীক্ষা করে দেখব। আমার কি মনে হচ্ছে জানেন ?

কি মনে হচ্ছে ? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে কেলি।

মনে হচ্ছে যে খুন একটা হয়েছে এবং খুনের পর পোকাগুলো লাশের ওপর জমায়েত হয়েছিল, আপনি আরও খুঁটিয়ে তদন্ত চালান,

নিশ্চয় সূত্র পাবেন।

আপনি কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, আপনি যা জানেন আমরা তার কিছুই জানি না, আপনি ঠিকই বলেছেন তাই দেখব।

কিন্তু পরে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার দ্বারা দেখা যায় যে দু'জন মানুষই ভুল করেছিলেন।

মিস সারা সিফোর্ড ঈশ্বরে বিশ্বাসী একজন সমাজ সেবী। তিনি স্যালভেশন আর্মির সঙ্গে যুক্ত আছেন। পীড়িত ও দুস্থ মানুষের পাশে যেয়ে তিনি দাঁড়ান। যথা কর্তব্য করেন। সান্ত্বনা দেন তাদের বলেন ভগবানে বিশ্বাস রাখ তিনি তোমাকে সুস্থ রাখবেন। তাঁদের গির্জায় যে সব শিশুদের তিনি সানডে ইস্কুলে পাঠ দান করেন তাদেবও তিনি বলেন সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করবে তাহলে তিনি তোমাদের নীরোগ রাখবেন।

গত তিরিশ বছর ধরে তিনি সমাজ সেবা করে আসছেন। স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি নববর্ষে ও বি ই উপাধি পেয়েছেন। রাণী তাঁকে সম্মানিত করেছেন।

ভগবানে এমন যে বিশ্বাসী নারী যিনি বরাবর প্রচার করে আসছেন যে ঈশ্বরকে নিরন্তর স্মরণ করলে মানুষ নীরোগ থাকে এবং তিনি নিজে যে নিয়মিত বাইবেল পাঠ করে গির্জায় যান এবং দিনে নির্দিষ্ট একটা সময়ে ঈশ্বরের ধ্যান করেন সেই মানুষকেই কিনা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসতে হল ?

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত সম্মান পেয়ে তিনি খুশি কিন্তু তিনি ও বি ই অপেক্ষা আরও একটু উচ্চ সম্মান আশা করেছিলেন। তাঁর বয়স এখন ছাপান্ন, তিনি ধনী পরিবারের কন্যা। তিনি নিজের অর্থ ব্যয় করে দুস্থদের সেবা করেছেন। এখন তিনি আশা করছেন ভগবান তাঁর জন্য পরলোকে একটা স্থান নির্দিষ্ট করে রাখবেন।

মিস সারা তাঁর বন্ধুদের বলতেন যে তিনি যদি রোমান ক্যাথলিক হতেন তাহলে তিনি নান হতেন এবং যীশুকে বিবাহ করতেন অর্থাৎ আজীবন কুমারী থাকতেন। অবশ্য এখনও তিনি কুমারীই আছেন এবং সেই পরমপিতার কাজই করছেন।

কিন্তু তাঁর এই রোগ হল কেন? তিনি শুদ্ধ-চরিত্র, পুরুষের সঙ্গে কখনও মেলামেশা করেন নি, সুরা বা ধূমপান করেন নি এবং তাঁরই ফুসফুসে সেই ব্যাধি হল যা তাঁর মতো পূত চরিত্র নারীর হওয়া উচিত ছিল না।

ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস অগাধ। তিনি রোগ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করছেন। একটা বড় অপারেশন হয়ে গেছে এবং আগামীকাল আর একটা অপারেশন হবে।

এতদিন তিনি নিজের সব কাজ নিজেই করে এসেছেন, স্বাবলম্বে তিনি বিশ্বাস করেন, পরকে বলেন সেলফ হেলপ ইজ দি বেস্ট হেলপ আর হাসপাতালে এসে তাঁকেই কিনা পরের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে? কি লজ্জা!

তাঁকে এখন হসপিটাল বেডে যে ভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছে তাতে তাঁর নড়বার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁকে দুই হাতে একই সঙ্গে ব্লাড ও স্যালাইন ড্রিপ দেওয়া হচ্ছে এবং অকসিজেন টেন্টের মধ্যে তাঁকে রাখা হয়েছে।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। নিজের হাত তোলবার ক্ষমতা নেই, কেউ এসে ভিজে ঠাণ্ডা তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিলে ভাল হয়। কিন্তু আপাততঃ একজন মাত্র নার্স রয়েছে আর তাকে দেখতে হচ্ছে তিনটে প্রাইভেট রুম।

এদিকে ঘুম আসছে না। বই পড়তে পারলে ঘুম আসত। অতএব খুব সাবধানে ধীরে ধীরে কোনোরকমে বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে একখানা উপন্যাস তুলে নিলেন। এই উপন্যাসখানা তিনি পড়ছিলেন।

বইখানা চোখের কাছে এনে পড়তে হচ্ছিল কারণ তাঁর চশমা জোড়া রয়েছে অকসিজেন টেণ্টের বাইরে।

বই পড়তে পড়তে চোখের কোণ দিয়ে তিনি যেন জানলার নিচে রক্ষিত সেণ্ট াল হিটিং রেডিয়েটরের কাছে কিছু একটা নড়াচড়ার লক্ষণ দেখতে পেলেন। কিছু একটা নড়ে উঠল। আরশোলা না'কি? হাসপাতালে এমন পরিষ্কার ঘরে আরশোলা কোথা থেকে আসবে?

মিস সারা বইখানা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন। তারপর যেখানে নড়াচড়ার লক্ষণ দেখেছিলেন সেই দিকে চোখ ফোকাস করলেন। হ্যাঁ, ঐ তো কি একটা দেখা যাচ্ছে? কালো মতো, ছোট, তাঁরই দিকে যেন এগিয়ে আসছে। ওটা কি হতে পারে? নিশ্চয় পোকা নয়। হাসপাতালে পোকা মাকড় আশা করা যায় না। অসম্ভব। মিস সারা পরিচ্ছন্নতা ও শুদ্ধতায় বিশ্বাসী, ঈশ্বরের পরেই ওদের স্থান। হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন এবং শুদ্ধ। অতএব হাসপাতালে পোকার অস্তিত্ব টের পেয়ে তিনি একটু মানসিক আঘাত পেলেন, বিরক্তও হলেন।

মিস সারা আরও কয়েকটা পোকা দেখতে পেলেন, রেডিয়েটর থেকে বেরিয়ে আসছে। চোখে চশমা ছিল না, স্পষ্ট দেখতে না পেলেও সেগুলো যে পোকা তা তিনি বিনা চশমাতেও বুঝতে পারছিলেন। ইস্ এই হাসপাতালটা তো তাহলে নোংরা এবং অপবিত্র। পোকাগুলোকে এখনি তাড়ানো দরকার। কিন্তু তিনি তো তাড়াতে পারবেন না, কাউকে ডাকা যাক।

খাটের মাথার দিকে দেওয়ালে একটা বোতাম আছে। নার্সকে দরকার হলে সেই বোতাম টিপলেই নার্স আসবে। ড্রিপ টিউবগুলি যাতে নড়াচড়ায় খুলে না যায় সেদিকে সতর্ক থেকে তিনি যতদূর সম্ভব দেহ বেঁকিয়ে দেখলেন যে বোতাম পর্যন্ত তাঁর আঙুল পৌঁছবে না। তাঁর মনে পড়ল সেই দিনই তাঁর খাটখানা দেওয়াল থেকে

কিছু এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুবই বিরক্ত হলেন, রাগও বলা যায়। মেঝের কারপেট পরিষ্কার করার জন্যে বুঝি খাট সরাতে হয়েছিল। কিন্তু কারপেট পরিষ্কার করে খাট আর যথাস্থানে সরানো হয় নি।

ততক্ষণে মেঝেতে আরও অনেকগুলো পোকা জমেছে। সেগুলো রেডিয়েটর থেকে বেরিয়ে সার বেঁধে তাঁরই খাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

তিনি মৃদু আর্তনাদ করে উঠলেন। তিনি সম্পূর্ণ অসহায়। পোকাগুলো কি তিনি চিনতে পারছেন না। তিনি চিৎকার করে উঠলেন কিন্তু অকসিজেন টেন্ট ভেদ করে সে আওয়াজ বাইরে পৌঁছল না। ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি তাঁর খাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

করিডরেও কেউ নেই। পোকাগুলো খাটের পায়া বেয়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। অকসিজেন টেন্ট দিয়েও ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। কয়েকটা পিছলে পড়েও যাচ্ছে। তবুও তারা নিরুৎসাহ হচ্ছে না।

তিনি শুয়ে পড়েছেন। আরে? কয়েকটা পোকা তো খাটের গদির ওপর উঠেছে। অকসিজেন টেন্ট না থাকলে এতক্ষণে তাঁর গায়ে উঠে পড়ত। পোকার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে, তাঁর থেকে ওরা রয়েছে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। ভেতরে ঢুকতে না পেরে অকসিজেন টেন্ট বেয়ে ওপরে উঠছে।

ভয়ে চোখ বড় করে তিনি দেখতে পেলেন গোটা কুড়ি পোকা অকসিজেন টেন্টের ছাদে উঠে ঠিক তার মুখের ওপর উঠে পড়েছে। পোকাগুলো তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

পোকাগুলোর নিচের দিকটাই তিনি দেখছিলেন। রং ম্যাটমেটে কালো। দেহটা তিনভাগে বিভক্ত, প্রতি ভাগ থেকে দুটো করে পা বেরিয়েছে, মোট ছ'টা পা। মাথাটা কি বিশ্রী কালো, দুটো শুঁড় বেরিয়েছে। শুঁড়দুটো এদিক ওদিক নাড়ছে, কি যেন খুঁজছে। তাঁর

সঙ্গে তফাৎ তো শুধু পাতলা ও স্বচ্ছ অকসিজেন টেন্টটুকু। তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছে।

মিস সারা আরও লক্ষ্য করলেন যে পোকাগুলো হাঁ করছে, ক্ষুদে হলেও যেন রাক্ষসের হাঁ আর ঠোঁটগুলো কি বিশ্রী। ঐ ঠোঁট দিয়ে চুষে চুষে কি খায়?

পোকা মানুষের ক্ষতি করে না, ওগুলো শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবান ওদের পাঠিয়েছেন। ওদের ভয় করার কিছু নেই। তবে সব পোকার সংস্পর্শে তো তিনি আসেন নি তাই তাঁর ধারণা এইরকম ছিল। অবশ্য খারাপ পোকাও আছে, সেগুলো অন্ধকারে থাকে, মানুষকে কামড়ায়, সেগুলো শয়তানের অনুচর।

এখন তিনি ভয়ে কাঁপছেন। স্বাভাবিক অবস্থাতেই ভয় পাবার কথা, এখন তো তিনি অসুস্থ, বেশি ভয় পাবারই কথা। চোখের জল তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে বালিশ ভেজাতে লাগল।

এবার দেখলেন পোকাগুলো টেন্ট ভেদ করে ঢুকতে না পেরে সার বেঁধে নেমে যাচ্ছে। তিনি আশ্বস্ত হলেন। তিনি চোখ বুঁজে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলেন। বিপদে ভগবান তাঁকে ত্যাগ করেন নি। কোনো উদ্দেশ্যে ভগবান তাঁকে পরীক্ষা করছেন।

কিন্তু ভগবান তাঁকে ত্যাগ করেছেন, টের পেলেন পর মুহূর্তে যখন বাঁ হাতের কব্জিতে অতর্কিতে একটা দংশন অনুভব করলেন। তিনি ভয় পেয়ে চিৎকার করতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না, গলা থেকে শুধু একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোল। কে যেন গলা চেপে ধরল।

একটা নয়, কোনো একটা ছিদ্রপথ পেয়ে টেন্ট থেকে নেমে পোকা-গুলো তাঁর বিছানার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বোতাম টেপবার জন্যে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে বসলেন, উঠতে গিয়ে বাঁ হাতের রক্তবাহী সেই টিউব ও তার ডগে লাগানো হাইপোডারমিক ছুঁচ তাঁর কব্জির শিরা থেকে ছিন্ন হল। স্ট্যাণ্ডের ওপর থেকে রক্তের থলিটা মেঝেতে পড়ে

গেল। পড়বার আগে কিছু রক্ত তাঁর বিছানাতেও ছিটকে পড়ল আর ওদিকে তাঁর শিরা থেকেও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।

পোকাগুলো যে রক্তচোষা গুবরে তা তো মিস সারা জানেন না। কোথা থেকে অজস্র পোকা এসে মেঝেতে ও বিছানায় এবং মিস সারার কব্জিতে রক্ত চোষার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল। যে পোকাগুলো চলে যাচ্ছিল সেগুলো রক্তর গন্ধ পেয়ে ফিরে আসতে লাগল।

কি দ্রুত গতিতে পোকাগুলো আসছে! মিস সারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। বেপরোয়া হয়ে তিনি নার্সকে ডাকবার জন্যে বোতামে হাত দিলেন কিন্তু টিপতে পারলেন কি?

আগে কব্জিতে একটা দংশন অনুভব করেছিলেন কিন্তু এবার যে শিরামুখ দিয়ে তার শরীরে রক্ত সঞ্চার করা হচ্ছিল এখন ঠিক সেইখানে তীব্র একটা দংশন অনুভব করলেন, ছুরির ডগা দিয়ে কে যেন সেখানটা চিরে দিল। সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন রক্তচোষা একটা গুবরে রক্ত চুষছে। হাত ঝাঁকি দিলেন। পোকার পড়ে যাবার লক্ষণ নেই।

এখন একমাত্র পথ অপর হাত দিয়ে গুবরেটাকে ধরে ফেলে দেওয়া। কিন্তু তাহলে স্যালাইনের টিউবটা খুলে যেতে পারে। মুখ দিয়ে কান্না মিশ্রিত একরকম আওয়াজ করে তিনি পোকাশুদ্ধ কব্জিটা বিছানার চাদরে ঘসতে লাগলেন। কিন্তু ঠিকভাবে ঘসবার আগে পোকাটা ছিটকে বেরিয়ে এসে মিস সারার দিকে ড্যাব করে চেয়ে শুঁড় নাড়তে লাগল। তারপর পোকাটা পিঠ কুঁজো করল আর সঙ্গে সঙ্গে মিস সারা কি রকম একটা গন্ধ অনুভব করলেন। এমন গন্ধের সঙ্গে তাঁর কখনও পরিচয় হয় নি।

সেই গন্ধ বোধহয় একটা সংকেত চিহ্ন কারণ সঙ্গে সঙ্গে আরও পোকা এসে পড়ল। চাদরে রক্তের যে সব ফোঁটা পড়ে ছিল পোকা গুলো তার ওপর বসল।

মিস সারা এবার একটা মারাত্মক ভুল করলেন। তিনি গায়ের

চাদরটা ফেলে দিলেন। তাঁর সমস্ত বুক ও পেটের কিছু অংশ জুড়ে ব্যাণ্ডেজ করা ছিল। ব্যাণ্ডেজে অনেক জায়গায় রক্ত লেগে ছিল।

তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে রক্তচোষা গুবরে পোকার ঝাঁক তাঁর সারা দেহ ছেঁকে ধরল। পোকার আক্রমণে ও:মিস সারার নড়াচড়ার ফলে ব্যাণ্ডেজ আলগা হয়ে গেল। যে সব জায়গায় স্টিচ করা হয়েছিল সে সব জায়গার অনেক অংশ বেরিয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে পোকার পর পোকা সেখানে তাদের শুঁড় ঢুকিয়ে দিল।

মিস সারা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন, হে ঈশ্বর আমাকে বাঁচাও। তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তাঁর এমন বিপদ ঘটেছে। উঃ ভগবান আমাকে এত শাস্তি দিচ্ছ কেন?

আগের বারে নার্সদের ডাকবার বোতাম টিপতে পারেন নি। এবার বোতাম টিপতেই হবে তাতে যা হয় হবে। তিনি হাত বাড়ালেন আর মাত্র এক ইঞ্চি কিন্তু এবারও পারলেন না। কিন্তু দেওয়ালে হাত লাগল তো! তাহলে বুঝি বোতামটা ও জায়গায় নেই।

ইতিমধ্যে অনেক পোকা তাঁর সমস্ত দেহ ছেঁকে ফেলেছে। তিনি কখন অপর হাতটাও সজোরে নেড়েছেন আর স্যালাইন টিউব ও হাইপোডারমিক ছুঁচও খুলে গেছে।

সব মিলে ভয়, যন্ত্রণা, অদ্ভুত এক অনুভূতি। তাঁর মনে হল এখনি বোধহয় তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে খাটের ওপর তিনি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মেঝের উপর পড়ে গেলেন। পড়ে যেয়ে হাতের হাড় ভেঙে হাড় বেরিয়ে পড়ল। ভাঙা জায়গায় চাপ চাপ রক্ত আর সেই চাপ চাপ রক্তের ওপর চাপ চাপ রক্তচোষা পোকা।

মিস সারা গিফোর্ড মনে করতেন এই গুবরে পোকাগুলো শয়তানের অনুচর। আর যে গুবরে পোকা তাঁকে আক্রমণ করে তার জীবন শেষ করে দিল সেই গুবরে পোকার নাম ডেভিল'স কোচ হর্স।

চিফ ইনস্পেক্টর কেলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গুবরে পোকার নমুনাগুলো পকেটে ভরে গোমড়া মুখ করে ওয়ারেন ওকস ফেরবার পথে মধ্য কেমব্রিজের একটা পাবে ঢুকল কিঞ্চিৎ সুরা পান করে মেজাজটা ঠিক করে নেবার জন্যে।

যে যুবক যুবতীটি কবরখানায় 'খুন' হয়েছিল তাদের লাস ওকসকে কেলি দেখায় নি, তবে তাদের মোটামুটি একটা বর্ণনা দিয়েছিল। সেই বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তাদের চেহারা কেমন হতে পারে সুরা পান করতে করতে ওকস তাই ভাবতে লাগল।

ওকস খুব ছোটবেলা থেকে পোকা-মাকড় নাড়াচাড়া করছে। তাঁর সহপাঠীরা যখন ডাক টিকিট জমাতো, ওকস তখন ঝোপেঝাড়ে বা মাঠে বিচিত্র ধরনের পোকা খুঁজে বেড়াত। কত পোকার লারভা নিয়ে এসে কাঁচের পাত্রে রেখে দিত সেই সঙ্গে কয়েকটা কচি পাতাও রেখে দিত যাতে লারভাগুলো না খেয়ে মরে যায়।

প্রতিদিন দেখত লারভাগুলোর কি পরিবর্তন হচ্ছে। তারপর দেখত লারভা কি করে ধীরে ধীরে মথ, প্রজাপতি বা অন্য কোনো পোকায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

অতএব ইনস্পেক্টর কেলি গুবরে পোকাগুলোকে যতদূর নৃশংস মনে করছে ওকস তা মনে করছে না। মানুষ মারতে পারে, মানুষের রক্ত চুষে খায়, কুরে কুরে মানুষের মাংস খেয়ে তাদের দেহ ঝাঁঝরা করে দেয় এমন পোকা সে দেখে নি বা এমন অবিশ্বাস্য কথা সে বিশ্বাস করতে রাজি নয়, অবিশ্যি তাঁর এক অধ্যাপক বলতেন যে প্রাকৃতিতে সর্বদা অঘটনের জন্যে নিজেকে তৈরি রাখবে। তা বলে মানুষখেকো বিট্‌ল্‌।

ল্যাবরেটরিতে ফিরে সে গুবরে পোকাগুলো উত্তমরূপে পরীক্ষা করল কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য তার নজরে পড়ল না। তবুও তার খটকা লেগেছে। সে তো দেখেছে জীবের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয় যাকে তারা মিউটেশন বলে। এই রকম

মিউটেশন দ্বারা নিরীহ গুবরে কি হিংস্র হতে পারে না ?

ওকসের মাথায় ঘুরতে লাগল মিউটেশন। মাথা থেকে চিন্তা আর যায় না। সন্ধ্যার পর এক সময় মাথা থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গ্লোরিয়া নামে পরিচিত তার একটি মেয়েকে ফোনে ডাকল। তাকে বলল :

অনেক দিন চাইনিজ ফুড খাই নি অথচ একা খেতেও ভাল লাগছে না, তুমি আসবে ? তাহলে দু'জনে একসঙ্গে বেশ জমবে। তারপর চাইনিজ রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে একটা ভডভিল শো দেখে দু'জনে একত্রে রাত্রিটা কাটানো যাবে। কোথায় ? কোথায় আবার ? আমার ব্যাচেলারস ফ্ল্যাটে। চলে এস।

গ্লোরিয়া এল তারপর দু'জনে এক বিখ্যাত চাইনিজ রেস্তরাঁয় যেয়ে উত্তম চাইনিজ ফুড এবং কিছু ফরাসি সুরা পান করে ভডভিল দেখে ওকসের ফ্ল্যাটে গমন এবং তারপর দু'জনে একই শয্যায় শয়ন।

ওরা ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েছে বোধহয়। ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠল। দু'জনেই রীতিমতো বিরক্ত। এত রাত্রে কে জ্বালাতন করছে।

ঠোঁটে একটা অশ্রাব্য গালাগাল নিয়েই ওকস তেড়েমেড়ে উঠে ফোন ধরে বলল : ঘড়ি দেখেছ ? রাত্রি ক'টা বেজেছে জান ? এই সময়ে—

সব জানি ডঃ ওকস, এত রাত্রে বিরক্ত করা যে অন্যায় তাও জানি এবং আপনার গালাগাল সম্বন্ধে সচেতন হয়েই আপনাকে ফোন করছি···

কে ? ইনস্পেক্টর কেলি নাকি ! কি ব্যাপার ?

ব্যাপার খুবই সিরিয়স। আমি অ্যাডেনব্রুকস হসপিটাল থেকে কথা বলছি। আপনি এখনি এখানে চলে আসুন।

আপনি কি বলছেন ? আমি হসপিটালে :কেন যাব ? আমার সঙ্গে হসপিটালের কি সম্পর্ক ? আপনি কি আবার পোকা নিয়ে নতুন কোনো থিওরি আবিষ্কার করলেন নাকি ?

এখন আর থিওরি নয় ডকটর ওকস, এখন নিষ্ঠুর সত্য, আমার তো মনে হচ্ছে ঘটনাটা এখনি প্রাইম মিনিস্টারকে জানান দরকার। শুনুন, আমি একটা গাড়ি পাঠিয়েছি, কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ি আপনার বাড়ি পৌঁছে যাবে। কথা শেষ করে কেলি রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ডঃ ওকস বিমূঢ়, বিস্মিত! তিনি ফোনটার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, কি এমন ঘটল যে প্রাইম মিনিস্টারকে জানাতে হবে?

ইনস্পেক্টর কেলির উদ্দেশ্যে কয়েকটা কটু মন্তব্য করে ওকস বাইবে বেরোবার পোষাক পরতে গেল। কেলির ওপর মনে মনে খুব বিরক্ত! এত রাত্রে ঘুম থেকে তোলার কি দরকার ছিল? কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেত না? সে তো আব মানুষের চিকিৎসা করে না যে আমি না গেলে রোগী মারা যাবে? গ্লোরিয়ার মতো যুবতীকে ছেড়ে এখন কার যেতে ইচ্ছে করে।

ওকস যখন জুতোর ফিতে বাঁধছে তখন তার দরজায় কলবেল বেজে উঠল। গ্লোরিয়ারও ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ওকস, এতরাত্রে কোথায় যাচ্ছ?

বিরক্ত হয়ে ওকস বলল, জাহান্নমে। তুমি এখন ঘুমোও। আমি ফিরে এলে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তবে যাবে।

ওকস দরজা খুলে দিল। ইউনিফরম পরা একজন সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করল:

ডকটর ওকস? আমাকে চিফ ইনস্পেক্টর কেলি পাঠিয়েছেন।

ওকস ঘাড় নেড়ে বলল, চল। গাড়িতে ওকস পিছনের সিটে বসল। কেম্ব্রিজের নির্জন রাস্তা দিয়ে গাড়ি দ্রুত বেগে চলল।

সার্জেণ্টকে ওকস জিজ্ঞাসা করল: ব্যাপারটা কি? তুমি কিছু জান সার্জেণ্ট?

সার্জেণ্ট বলল, সরি স্যার, কিছু বলা নিষেধ। চিফ আমাকে সেই রকম অর্ডার দিয়েছেন। আপনি হসপিটালে পৌঁছলে তিনি নিজেই আপনাকে সব কিছু বলবেন।

ওকস বিরক্ত হয়ে বলল, ব্যাপার মন্দ নয়, এই ঠাণ্ডায় ঘুম থেকে তুলে টানতে টানতে নিয়ে যেয়ে তিনি আমাকে চমকে-দেওয়া একটা খবর দেবেন।

ইয়েস স্যার, ঠিক তাই।

যাই হক ব্যাপারটা গুরুতরই মনে হচ্ছে নইলে মাঝরাতে চিফ ইনস্পেক্টর কেলি এতরাত্রে আমাকে ঘুম থেকে তুলবেন কেন? তিনি নিজেও তো ঘুম থেকে উঠে হাসপাতালে ছুটেছেন।

আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার, ব্যাপার খুবই সিরিয়স।

ওকস হাসপাতালে পৌঁছে দেখল ইনস্পেক্টর কেলি তার জন্য হাসপাতালের এমারজেন্সির ওয়েটিং হলে দাঁড়িয়ে তার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

ওকস গাড়ি থেকে নামতেই কেলি বলল, এই মাঝরাতে আপনাকে ঘুম থেকে তুলে আনার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত ডকক্টর ওকস, আমি ক্ষমা চাইছি। সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আপনি আমার সঙ্গে আসুন এই যে এইদিকে।

মাথায় লেখা, প্রাইভেট : স্টাফ ওনলি, লেখা একটা দরজার ভেতর দিয়ে ওঁরা দু'জন একটা রেস্টরুমে প্রবেশ করল। শিফট বদলের অন্তর্বর্তী সময়ে ডাক্তার ও নার্সরা এই ঘরে অপেক্ষা করে।

ঘরের মাঝখানে রয়েছে একটা নিচু কফি টেবল, সেটা ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। এধারে ওধারে কয়েকটা শোফা ও একটা ডিভান।

সার্জনরা তাঁদের ছুরি কাঁচি ইত্যাদি বহন করবার জন্য যেমন স্টেনলেস স্টীলের চকচকে বাক্স ব্যাবহার করেন, টেবিলের মাঝখানে সেইরকম একটা বাক্স রয়েছে।

কেলির মুখ রীতিমতো গম্ভীর, গম্ভীরতর কণ্ঠে বলল : বাক্সটা খুলে দেখুন।

কেলির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার চেয়ে ওকস বাক্সটা নিজের

কোলের ওপর তুলে নিল তারপর একটু জোর দিয়ে বাক্সর ঢাকা খুলে ভেতরটা দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বলল :

যীশাস ! মাই গুডনেস ! এখানেও !

সেই গুবরে পোকা ঠিক যেমনটি সে হাসপাতালের মর্গে প্লাস্টিকের থলেতে দেখছিল ! ঠিক একই রকম তবে এগুলো রক্তমাখা।

এগুলো তুমি কোথায় পেলে ইনস্পেক্টর ?

বলছি, কিন্তু এগুলো কি ?

কেন ? তুমি তো জান এগুলো কি ?

ঠিক, আমিও জানি। সেবার আমার সন্দেহ ছিল কিন্তু এবার বলছি এই গুবরেগুলো খুনী। এগুলো আমি পেয়েছি এই হাসপাতলেই এক রোগীর বেডে, মাত্র এক ঘণ্টা আগে···।

কি বললে ? এই হাসপাতালে ? কি বলছ তুমি ?

এবং সেই বেডে যে রোগী ছিল সেই রোগীকে এই পোকাগুলোই মেরেছে এবং সেই রোগীর শরীরের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না ; পোকাগুলো তাকে কুরে কুরে খেয়ে প্রায় শেষ করে এনেছিল। আমি অনেক লাশ দেখেছি কিন্তু এমন বীভৎস দৃশ্য আর কখনও দেখি নি।

অবাক বিস্ময়ে ডঃ ওকস ইনস্পেক্টর কেলির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কেলি বলল : আমি এই হাসপাতালের কর্তাদের বলেছি হাসপাতাল এখন বন্ধ রাখতে, সমস্ত বিভাগ।

বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ইনস্পেক্টর। গোটাকতক পোকাকে তোমার এত ভয় ?

কেলি বলল, আমার কথা শেষ হয় নি। মিস সারা গিফোর্ড নামে যে মহিলাটিকে এই পোকাগুলি হত্যা করেছে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি নন। হ্যাঁ, হত্যাই আমি বলব কারণ একটা হাসপাতালের সার্জারি কেসের সব ক'জন রোগীকে এই পোকার দল মেরে ফেলেছে।

চোখ বড় বড় করে ওকস কথাগুলো শুনল কিন্তু তার বিশ্বাস

করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। পোকা হাসপাতালভর্তি মানুষ মেরে ফেলে এমন কথা কে বিশ্বাস করতে চায়। কোনো রোগ জীবাণুর আক্রমণে একটা শহরের মানুষ মরে যেতে পারে কিন্তু পোকা মানে গুবরে পোকার আক্রমণে এতগুলো মানুষ মারা গেল এমন কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

কেলি বলতে লাগল, আমি জানি না ঠিক কি ঘটেছিল কিন্তু আমরা যখন এই হাসপাতালে পৌঁছলুম তখন চারদিকের বীভৎস দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল বুঝি বা একটা পাগল ধারালো তলোয়ার হাতে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে গেছে। কয়েকটা লাশের দেহে তো মাংস প্রায় নেই বললেই চলে, তাদের কঙ্কালে কোনো কোনো জায়গায় কিছু মাংস লেগে আছে মাত্র, সে আমি বলতে পারব না ডকটর ওকস, আমি পুলিসের লোক, অনেক খুনজখম দেখেছি তাই কোনোরকমে সেই নারকীয় দৃশ্য সহ্য করতে পেরেছি, আপনারা হলে নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে যেতেন।

তুমি কি বলতে চাও পোকাগুলো এইজন্যে দায়ী? অন্য কিছু নয়?

এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না?

অপারেটিং থিয়েটারে এবং অন্যত্র আমরা এই রকম অনেক ব্লাড-সাকার বিট্‌ল্ পেয়েছি।

এ তো···

অসম্ভব? অবিশ্বাস্য? এই হাসপাতালে আসবার আগে আমিও বিশ্বাস করি নি, নিজের চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতুম না। ঠিক আছে, কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আমার সঙ্গে আসুন।

বেশ চলুন।

আপনার হার্ট স্ট্রং তো? পেট রোগা নয় তো? আপনি কোনো হরর ফিল্মেও এমন দৃশ্য দেখেন নি।

ডঃ ওকস বললেন, তাই নাকি? তবে পোকা, যেমন পঙ্গপাল

মানুষের অশেষ ক্ষতি করে। কত পোকা রাতারাতি ক্ষেতের শস্য খেয়ে ফেলে তা তো আমি জানি···।

কিন্তু আমি যা দেখাবো তা আপনি জানেন না।

সত্যিই ডঃ ওকস জানত না, ভাবতেও পারে নি যে দুঃস্বপ্নে দেখা বুক চাপা বিকট দৃশ্য তাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে তার গা গুলিয়ে উঠল, সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে! সে এ কি দেখছে!

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তো একটা বিশ্রী গন্ধ তার নাকে ধাক্কা মেরেছিল। অপারেশনের সার্জন যেমন মাস্ক বা মুখোস পরেন সেই রকম একটা মুখোশ কেলি ডঃ ওকসকে দিল, নিজেও একটা পরল।

অপারেটিং থিয়েটারে সব কটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল অতএব সবই স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে দেখা যাচ্ছিল।

ডঃ ওকসের প্রথমেই যেটি চোখে পড়ল সেটি পুরুষ বা রমণীর দেহাবশিষ্ট বা কোনো জন্তুর তা বোঝবার কোনো উপায় নেই। কেউ একজন বলল, ওটি একটি তরুণীর লাশ।

লাশ? একদা তাই ছিল বোধ হয় কিন্তু এখন আর তা নেই। মাথার চুল, নখ আর হাড়গুলো এবং মেয়েটির দেহে রক্ত ও অকসিজেন সঞ্চারিত করা হচ্ছিল, সেই সংক্রান্ত সরঞ্জামগুলি সেই মাংসাশী রক্তচোষার ঝাড় খেতে পারে নি তাই সেগুলি পড়ে আছে নচেৎ কিছুই বাকি থাকত না।

আর একটি যুবতী। তার বুঝি অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করা হয়েছিল। তার চামড়াটা হাড়ের ওপর লেগে আছে। চামড়ার নিচে যা কিছু ছিল, হাড় ব্যতীত সব কিছু খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।

অপারেশন থিয়েটারে পলের আর এক মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। তবুও আরও কিছু দেখতে হল। একজন অ্যানেসথেটিস্ট এবং একজন নার্সও অব্যাহতি পায় নি। অ্যানেস-থেটিস্টের তিন দিন আগে বিয়ে হয়েছে আর নার্সটির তিন দিন পরে

বিয়ে হবার কথা ছিল।

ডঃ ওকস হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। এমন সময় কেলি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল, ঐ দেখুন ডকটর, না না ওদিকে নয়, ঐ যে মেঝেতে, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন, ঐ শাদা টাইল পাতা ফ্লোরের ওপর?

হ্যাঁ, ডকটর ওকস দেখতে পেয়েছে। যে পোকাটা চলে বেড়াচ্ছে সেটা চিনতে তার একটুও দেরি হল না। কালচে ব্রাউন রঙের ব্লাড সাকার বিট্‌ল্ ডেভিল'স কোচ হর্স।

কেমব্রিজে এনটোমলজি ইনস্টিটিউটের দোতলায় টেরাসে দাঁড়িয়ে ডঃ ওকস দেখছিলেন বুলডোজার বড় বড় গাছগুলো কি ভাবে ডাল-পালা সমেত উপড়ে ফেলছে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, কি আফশোস, এই গাছগুলো পঞ্চাশ বছর ধরে ধীরে ধীরে বড় হয়েছে আর সেগুলো ধ্বংস করতে পঞ্চাশ মিনিটও লাগল না।

ইনস্টিটিউটের চার দিকের গাছ কেটে পরিষ্কার করে ফেলা হল যাতে সামনেটা ফাঁকা হয়ে যায়, এবং অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। প্রস্তাবটা আংশিকভাবে ওকসই করেছিল। এখন তার আফসোশ হচ্ছে, গাছের অভাব এখনই সে মর্মে মর্মে অনুভব করছে। দৃশ্যটা হঠাৎ কেমন বদলে গেল। ওকসের মনে হল সে যেন মরুভূমিতে বসে আছে। এখন আর উপায় নেই, গাছগুলোকে যথাস্থানে আর পোঁতা যাবে না।

গাছ কাটার কারণ কি?

ব্লাড সাকার বিট্‌ল্ ডেভিল'স কোচ হর্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। এনটমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট এখন ওঅর হেড কোয়ার্টার।

অ্যাডেনব্রুকস হাসপাতালের ঘটনার পর চিফ ইনস্পেকটর কেলি

আর এক দিনও দেরি করে নি। সে সেইদিনই লাঞ্চের পর লণ্ডনে যেয়ে বড় কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিল, তাদের বলেছিল যুদ্ধ-কালীন জরুরী অবস্থার মতো সব রকম আয়োজন করে এই বিপদের মোকাবিলা করতে হবে।

বড় কর্তারা গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেলিকে গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে দিলেন। পরদিন লণ্ডন থেকে পরামর্শ করে ফিরে এসে কেলি শুনল, আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, আরও অনেকগুলি প্রাণ গেছে।

পার্কে, ইস্কুলে, আর একটি হাসপাতালে ওরা হানা দিয়ে বেশ কিছু মানুষকে শেষ করে গেছে। সবচেয়ে ক্ষতি করেছে কেমব্রিজের বাজারে।

এই ঘটনাগুলি শুনে কেলি সঙ্গে সঙ্গে একটা জরুরী কমিটি অর্থাৎ ওঅর কাউনসিল গঠন করেছে যাতে, আর্মি, নেভি ও এয়ার-ফোর্স, পুলিস এবং বিজ্ঞানী আছেন। কুড়িজন মেম্বারের মধ্যে দু'জন কীটতত্ত্ববিদ। ডঃ ওকস অবশ্যই আছেন।

কমিটি গঠন করেই চিফ ইনস্পেক্টর কেলি প্রথমেই কেমব্রিজ শহর খালি করে দিল, জনসাধারণকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিল। ইতি-মধ্যে মানুষ ভীষণ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা বাথটবে নামতে সাহস করছিল না। বাড়ির ভেন্টিলেটর, রেনওয়াটার পাইপ, ফাটল, ঝোপেঝাড়ে সর্বত্র যেন রক্তচোষাদের দেখতে পাচ্ছিল।

কিন্তু কেলি যখন শহর থেকে লোক সরাচ্ছিল তখন তার বিরূপ সমালোচনা করা হল। পুলিসটা অহেতুক বাড়াবাড়ি করছে।

এনটমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের বাড়িতে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হল। গাছ তো আগেই কেটে ফেলা হয়েছিল, এখন চারদিকে পরিখা খনন করে তাতে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক ওষুধ যথা প্যারাথিয়ন, ম্যালাথিয়ন এবং নতুন ফরমুলার ডি. ডি. টি ছড়িয়ে দেওয়া হল।

কমিটির নাম দেওয়া হয়েছে স্পেশাল কণ্ট্রোল ইউনিট, সংক্ষেপে

এস সি ইউ বা স্কু। স্কু কমিটির একজন মেম্বার কেলিকে জিজ্ঞাসা করল, এই যে পরিখা খুঁড়লে, এতে কি কোনো কাজ হবে ?

জানি না। আমরা এমন শত্রুর সঙ্গে কখনও লড়াই করি নি। তার বিষয় আমরা এখনও কিছুই জানি না, আমরা সবকরম চেষ্টা করছি, শুধু কেমব্রিজ বা ইংলণ্ড বা ওপারে চিকাগো নয়, সারা মানব-সমাজ আজ বিপন্ন।

তাহলে আমরা কি ভাবে এই শত্রুর মোকাবিলা করব ?

তাও আমরা এখনও জানি না। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করবেন বা করছেন। তাঁরা যদি সফল হন তবে আমরা বাঁচব নচেৎ পৃথিবীর বুক থেকে মানুষ নামে জীব এবং অন্য জীবজন্তুও মুছে যাবে, কেলি বলল।

তারপর সব জন্তু যখন নিঃশেষিত হবে তখন এই রক্তচোষারা খাবে কি ? তাহলে অনাহারে ওরাও মরবে, কিন্তু এগুলো হঠাৎ আসছে কোথা থেকে ? আমাদের শত্রু কোনো দেশ ওগুলোকে আমাদের দেশে চালান করে দেয় নি তো ? নাকি ভিন গ্রহ থেকে ওগুলো আসছে ?

কেলি বলল, আমার এর কোনোটাই মনে হয় না তবে আপাততঃ তোমাকে একটা উপদেশ দিতে পারি, দাড়ি কামাবার সময় যেন গাল কেটে ফেলো না, রক্ত থেকে দূরে থাকবে কারণ রক্তের গন্ধ পেলেই পোকাগুলো ছুটে আসে। যেখানে যেখানে ম্যাসাকার হয়েছে সেখানে খোঁজ করে অন্ততঃ এইটুকু জানতে পেরেছি।

এই সময়ে ওদের দিকে ডক্টর আসছিলেন। চুল উস্কোখুস্কো, স্নান হয় নি, দাড়ি কামান নি, রাতে বোধহয় ঘুমও হয় নি। হাতে কাগজের প্যাড ও পেনসিল। খুবই ক্লান্ত।

তাকে এই রকম অবস্থায় দেখে এগিয়ে যেয়ে কেলি বলল, এ কি ডক্টর, এ কি চেহারা হয়েছে, রাত্রে ঘুমোও নি বুঝি, তুমি যাও, আর ঘুরে বেড়াতে হবে না, আমি ব্যবস্থা করছি, তুমি ঘুমোও গে যাও।

ঠিক বলেছ, আমি আমার ঘরে চললুম, বেশি নয়, চার ঘণ্টা

ঘুমোলেই আমি ফ্রেশ্ হয়ে যাব। তারপর আমি আবার চব্বিশ ঘণ্টা লড়ে যাব।

কেলি বলল, চলুন ডক্টর আপনার ঘর পর্যন্ত যাই। যেতে যেতে স্ক্রু-এর মেন কণ্ট্রোল রুমটা আপনাকে দেখিয়ে দোব।

মেন কণ্ট্রোল রুম দেখে ডক্টর অবাক। একি করেছ কেলি? এ যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে?

তাই কি নয় ডক্টর? ঐ দেখুন দেওয়ালে পুরো কেমাব্রজ শহর ও উপকণ্ঠের ম্যাপ। আর ঐ একটা ইংলণ্ডের ম্যাপ। আর এদিকে দেখুন কতকগুলো টেবিল, প্রতি টেবিলে দুটো করে টেলিফোন, প্রত্যেকটা ডাইরেক্ট লাইন।

ঐ বড় টেবিলটায় কি? স্পেশাল ফোন মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ ডক্টর, ঐ ফোনটা হল চিকাগোর সঙ্গে হট লাইন, যেটুকু রিপোর্ট পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছে চিকাগোর অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ। এ সব তো দেখলেন, দু'ঘণ্টার মধ্যে টেলেক্স মেসিন এসে যাচ্ছে। ছাদের ঘরে র‍্যাডার স্ক্রীন বসানো হবে। আমরা কোনোদিকে ফাঁক রাখব না এখন তোমরা চেষ্টা করে দেখ পোকাগুলোকে কি করে জব্দ করা যায়। কোথায় কোথায় অ্যাটাক হয়েছে বা একটাও পোকা দেখা গেছে তা সবই লাল বৃত্ত বসিয়ে ঐ ম্যাপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আপনাকে আর আটকে রাখব না, আপনি যান, স্নান করে শুয়ে পড়ুন। হ্যাঁ, দাড়িটাও কমিয়ে নেবেন, আপনাকে লাঞ্চের সময় ডেকে দোব।

পল নিজের ঘরে যেয়ে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে যেই শুয়েছে আর অমনি দরজায় কে নক করল।

দরজা খুলতেই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে একজন মেয়ে কনস্টেবল, এক হাতে স্টেনলেস স্টীলের টি-পট, অপর হাতে পোর্সিলেনের একটি মগ।

মৃদু হেসে মেয়েটি বলল, আমাদের চিফ আপনাকে এই চা পাঠিয়ে দিলেন, বললেন চা টুকু খেলে আপনার নার্ভগুলি কোমল হবে, ঘুম ভাল হবে।

থ্যাংক ইউ, ভেতরে এসে চা ঢেলে দাও, নতুন কিছু খবর এসেছে?

না ডঃ ওকস, গত ছ' ঘণ্টায় নতুন কোনো খবর হয় নি, চিফ বলছিল শহর খালি করে দিয়ে কাজ হয়েছে।

ওকস বলল, সেইখানেই তো আমার ভয় হচ্ছে। কেমব্রিজ হয়তো বেঁচে গেল কিন্তু রক্তচোষা শয়তানগুলোর যখন ক্ষিধে পাবে তখন ওরা অন্য জায়গায় আক্রমণ করবে, তাই না? তুমি আমার এই কথাটা তোমার চিফকে বলতে পার।

চার ছরের ফুটফুটে সোনালী মেয়ে অ্যানের আর ভাল লাগছে না। লণ্ডন থেকে নরউইচ ট্রেন জারনি কি শেষ হবে না। লণ্ডন স্টেশনে দাদীর দেওয়া পুতুলটা নিয়ে এতক্ষণ তো খেলা করল কিন্তু পুতুল তার কথার উত্তর না দিলে আর ভাল লাগে? দাদী যেসব চকোলেট, টফি আর লজেন্স দিয়েছিল সে কবে শেষ। মা অন্যদিন স্নো-হোয়াইট আর সিণ্ডারেলার গল্প কেমন চমৎকার ভাবে বলে কিন্তু যেভাবে বলল তা তার মোটেই ভাল লাগল না। মায়ের মেজাজটাও যেন ভাল নেই তাই তার মেজাজও ভাল নেই।

ঠিক তাই। অ্যানের মা মুরিয়েল ফ্রিম্যানের মেজাজ যেন সপ্তমে চড়ে আছে। যে কোনো সময়ে হয়তো ফেটে পড়তে পারে। সপ্তাহ শেষে সে লণ্ডনে গিয়েছিল মনটা একটু ভাল করতে কিন্তু তার বিক্ষিপ্ত মন যেমন ছিল তার চেয়ে বরঞ্চ আরও তিক্ত হয়েছে।

ক্ষুদে অ্যানের অবশ্য বেশ ভালই কেটেছে। লণ্ডনের গাড়ি বাড়ি আর একশো মজা দেখে সে অবাক তার ওপর দিদিমার আদর, যত ইচ্ছে টফি, লজেন্স আর যত ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে খেলা। বাবার অভাব সে একটুও অনুভব করে নি যেটা তার মা মর্মে মর্মে ও প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছিল।

মা হঠাৎ তাকে নিয়ে লণ্ডন নিয়ে এল এ জানবার বা বোঝবার দরকার অ্যানের নেই আর তাকে তার মা কারণটা বোঝালেও তার

ছোট মাথায় ঢুকতোও না।

ছোট্ট মেয়ে অ্যানকে সে কি করে বোঝাবে যে তার বিবাহিত জীবনের আটটা বছর বেশ সুখে ও আনন্দে কেটেছে। কিন্তু আট বছর পূর্ণ হতে না হতেই কালো মেঘ দেখা দিল।

স্বামী পিটার ফ্রিম্যান এঞ্জিনিয়ারিং সেলসম্যান, সে তার গাড়ি নিয়ে মেসিন বিক্রি করতে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে তাকে বাইরে তিন চার দিন পর্যন্তও কাটাতে হয়। সেই সময় পিটার কোথায় থাকে বা কি করে তা মুরিয়েল জানে না, জানা সম্ভবও নয়।

ব্যাপারটা ধরা পড়েছে প্রায় বছর দুই আগে। মুরিয়েল তার হাতের গ্লাভসজোড়া খুঁজে পাচ্ছিল না। গত দিন বিকেলে সে পিটারের সঙ্গে বেরিয়েছিল, গ্লাভস জোড়া বোধহয় গাড়িতেই ফেলে এসেছে।

গাড়িতে গ্লাভস জোড়া পাওয়া গেল এবং সেই সঙ্গে পাওয়া গেল একটা সিল্কের স্কার্ফ। স্কার্ফে তখনও যে সৌরভ লেগেছিল সেই সৌরভটি মেয়েদের খুব প্রিয়।

এর আগে পিটারের উপস্থিতিতেই গাড়িতে মুরিয়েল আধ প্যাকেট মাইনর অর্থাৎ ছোট সাইজের লেডিজ সিগারেট পেয়েছিল। সেদিন পিটার বলেছিল তাদের সহকর্মী মিসেস বেরেস ফোর্ডকে লিফট দিয়েছিল, প্যাকেটটা বোধহয় সে ফেলে গেছে।

সেদিন মুরিয়েলের খটকা লেগেছিল মাত্র কিন্তু পিটারের কথা বিশ্বাস করে ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু এই স্কার্ফ? পিটারকে প্রশ্ন করায় সে আমতা আমতা করেছিল, সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে নি। অতএব এখন আর শুধু খটকা নয়, মুরিয়েলের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগল। মুরিয়েল আবিষ্কার করল যে পিটার তাকে অযত্ন না করলেও একাধিক যুবতীর সঙ্গে পিটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে লিপ্ত।

মুরিয়েল অভিযোগ করলে পিটার ঝগড়া করে না, প্রতিজ্ঞা করে

এমন আর হবে না। ক্ষমা চায়, নতুন কিছু উপহার আনে কিন্তু কয়েক দিন পরে প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়।

সেদিন সে পিটারকে অনেক ভৎর্সনা করল, পিটার কোনো জবাব দেয় না, শুধু হাসে। নির্লজ্জ এই মানুষকে নিয়ে মুরিয়েল কি করবে? সে রাগ করে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনে মায়ের কাছে চলে আসে।

মায়ের কাছে আসার পর সে ভেবেছিল পিটার নরউইচ থেকে তাকে নিশ্চয় টেলিফোন করবে। একটা মিটমাট হবে। সে আবার ফিরে যাবে। কিন্তু পিটারের কোনো ফোন এল না।

সে শুনে এসেছিল পিটারকে ইউরোপের কোনো অফিসে বদলি করার কথা চলছে। বদলি হলে মন্দ হয় না। নতুন জায়গায় পিটারকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাততে পারবে, পিটারের স্বভাবের পরিবর্তন হতে পারে যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে সে পিটারকে সরাসরি বলে দেবে তাহলে সেও অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে। তারও চেহারা খারাপ নয়, অনেক পুরুষ ছুটে আসবে।

মনে মনে জানে তা সে পারবে না। যাইহক মায়ের কাছে তো আর বরাবর থাকা যায় না, তাছাড়া অ্যানের ইস্কুল আছে, বদলির কি কি হল সে খবরটাও নেওয়া দরকার। এইসব চিন্তা করে মেয়েকে নিয়ে মুরিয়েল লণ্ডনের গাড়িতে উঠে বসেছিল।

অ্যান কি করছে তা মুরিয়েল জানে না, সে নিজের চিন্তায় নিজে মগ্ন ছিল, অ্যান যে তাকে অনেকক্ষণ থেকে ডাকছে তা সে শুনেও শুনতে পায় নি। তার টয় মোটর সাইকেলে দম দেওয়া যাচ্ছিল না তাই সে মাকে ডাকছিল।

মোটর সাইকেলটা হাতে নিয়ে মুরিয়েল অন্যমনস্কভাবে দম দিয়ে অ্যানের হাতে দিল। কিন্তু একি হল? মোটর সাইকেল তো চলে না। ওমা! এ আবার কি?

ভেতর থেকে স্প্রিং বেরিয়ে এসেছে। সেই স্প্রিং ভেতরে ঢোকাতে গিয়ে অ্যানের হাতের ওপরের দিকে খানিকটা আঁচড়ে গিয়ে রক্ত

বেরিয়ে পড়ল।

ওমা, হাত কেটে গেল যে, এই দেখ রক্ত বেরোচ্ছে। এবার মুরিয়েলের দৃষ্টি মেয়ের দিকে পুরোপুরি আকৃষ্ট হল। সে মেয়েকে সান্ত্বনা দিল। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টিস্যু পেপারের রুমাল বার করে রক্ত মুছিয়ে দিল তারপর সুতির একটা রুমাল দিয়ে অ্যানের হাত বেঁধে দিল।

অ্যান শান্ত হয়ে অন্য একটা পুতুল নিয়ে নতুন করে খেলা আরম্ভ করল, তারপর খেলতে খেলতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তারপর কোথায় কোন স্টেশনে ঘটাং করে ট্রেন থেমে গেল, অ্যানেরও ঘুম ভেঙে গেল। তার মা তাকে একটা টফি দিল। টফিটা গালে ফেলে অ্যান নিজের মনে বক-বক করতে লাগল। এক এক সময়ে কথা থামিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করে, কি মা নরউইচ কি আসবে না? বাব্‌বাঃ ট্রেন তো নয় যেন ট্রাইসাইকেল! ওর কথা শুনে সহযাত্রীরা হাসে।

কেমব্রিজ স্টেশন তখনও কুড়ি মাইল, তারপর নরউইচ। ট্রেনটার সত্যি গতি নেই। সিগন্যাল পায় নি বলে মাঝ পথে একবার পাঁচ মিনিটের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অ্যান জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেল ব্যাপারটা কি? আরে জানলার কাঁচে এগুলো কি পোকা? এরকম পোকা তো সে কখনও দেখে নি। কালচে বাদামী রং, লম্বা ঠোঁট, লম্বা শুঁড়। এক জায়গা থেকে উড়ে আর এক জায়গায় যে থপ করে বসছে। যখন উড়ছে তখন বেশ পাতলা পাতলা দুটো ডানা দেখা যাচ্ছে কিন্তু যখন থপ করে বসছে তখন কিন্তু ডানার চিহ্ন একটুও দেখা যাচ্ছে না; মনে হচ্ছে পোকাগুলোর ডানা নেই। বেশ মজা তো। অ্যান সব ভুলে পোকাগুলো দেখতে লাগল।

ট্রেন আবার চলতে আরম্ভ করল। কিছু পরে কেমব্রিজ স্টেশনে এসে থামল। যাদের কেমব্রিজে নামার কথা তাদের কাউকে নামতে

দেওয়া হল না, তাদের বলে দেওয়া হল তাদের আত্মীয়-স্বজনকে কোথায় কোথায় সরানো হয়েছে। এরপর ট্রেন মাঝে আর থামবে না একেবারে নরউইচ।

ইতিমধ্যে কয়েকটা পোকা ট্রেনের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। অ্যান মজা দেখছে। কেমন গুটি গুটি চলে বেড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে, মাঝে মাঝে পিঠ বাঁকাচ্ছে। বেশ মজা তো।

দু একটা পোকা অ্যানের পা দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। জামার ওপরেও দু'একটা পোকা বসল। অ্যান সেগুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। ওর হাতে যেখানটা কেটে গিয়েছিল, যেখানে ওর মা রুমাল বেঁধে দিয়েছিল কখন একটা পোকা ব্যাণ্ডেজের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে কাটা জায়গাটা কুট করে কামড়ে দিয়েছে। দেখতে না দেখতে রুমালটার খানিকটা লাল হয়ে গেল।

পুতুল দম দেওয়ার চাবিটা হাতে নিয়ে তা দিয়ে অ্যান পোকাগুলো তাড়াবার চেষ্টা করল। আরও পোকা কোথা থেকে ছুটে এসে রুমালটা ঢেকে ফেলল। অ্যান ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুরিয়েল পরেছিল বড় গলার একটা ব্লাউস, বুকের খাঁজ পর্যন্ত উন্মুক্ত। অ্যানের হাতে যে দম দেওয়ার চাবিটা ছিল সেটার ডগ লেগে মুরিয়েলের কোমল বুক খানিকটা চিরে রক্তের রেখা আঁকল।

অ্যানের হাত থেকে কতকগুলো পোকা মুরিয়েলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোথা থেকে দ্রুত আরও পোকা এসে মা ও মেয়ে দুজনকে ছেঁকে ধরল। পোকাগুলো কামড়াচ্ছে, রক্ত চুষছে, খুব বেশি না হলেও যন্ত্রণা হচ্ছে। পোকা তাড়াতে যেয়ে মুরিয়েলের ব্লাউসটা ছিঁড়ে যেয়ে তার বুকের অধিকাংশ উন্মুক্ত হয়ে গেল, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। পোকা তাড়াবার যত চেষ্টা করছে পোকার সংখ্যা যেন তত বেড়েই যাচ্ছে। সে আর পারছে না।

কম্পার্টমেণ্টে আরও যাত্রী ছিল কিন্তু এখন সকলে পোকা মারতে বা তাড়াতে ব্যস্ত। সেদিন সকালে একজন ভদ্রলোক দাড়ি কামাবার

সময় গাল কেটে ফেলেছিল। একজন মহিলা ট্রেনে বসে নখ কাটবার সময় আঙুল কেটে ফেলেছিল। এরা কেউ রেহাই পেল না।

ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে অ্যান বুঝি একসময়ে বলেছিল, ড্যাডি কোথায়? ড্যাডি থাকলে পোকাগুলো মেরে ফেলত।

ট্রেন যখন নরউইচ পৌঁছল তখন মুরিয়েলের স্বামী নিয়ে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে চিরতরে। মা ও মেয়ে দুজনেই মৃত এবং ট্রেনের আরও অনেক যাত্রী।

পিটার ফ্রিম্যান গোলাপ ফুলের একটা তোড়া নিয়ে নরউইচ স্টেশনের প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করছিল। মুরিয়েলের সঙ্গে সে তার ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলবে অন্ততঃ নিজেদের মেয়ে অ্যানের স্বার্থে। মুরিয়েল তো ভাল মেয়ে, তাকে ভালওবাসে।

ট্রেন নরউইচ পৌঁছতে আর পঞ্চাশ মাইলও বাকি ছিল না।

ঘরখানার ছবি ওকস অনেকবার দেখেছে, খবরের কাগজে সাপ্তাহিক পত্রিকায় বা টেলিভিসনে। ঘরখানা সে যত বড় মনে করেছিল এখন এখানে এসে দেখছে ঘরখানা আরও ছোট।

ওক কাঠের তৈরি চকচকে পালিশ করা লম্বা একটা কাঠের টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে ঘরখানার সে মনে মনে সমীক্ষা করছিল। দেওয়াল কাঠ দিয়ে প্যানেলিং করা, সিলিং থেকে ঝুলছে দামী ঝাড় লণ্ঠন, দেওয়ালে বেশ কয়েকখানা অয়েল পেন্টিং, মেঝেতে কারপেট।

ওকস হল বিজ্ঞানী। এসব পুরনো বাড়ি, ঘর, ফারনিচার বা ছবির কোনো মূল্য নেই তবুও সে খুঁটিয়ে দেখছে। ঐতিহাসিক মূল্য হয় তো কিছু আছে, সে ভাবে।

ওকস ভাবছে, বর্তমান নিয়ে তাদের কারবার, ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবে কিন্তু অতীত? না, তার কাছে অন্ততঃ অতীতের কোনো দাম

নেই। আপাততঃ সে একটি সমস্যা নিয়ে পড়েছে। সমস্যাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মিঃ হার্বার্ট স্মিথ পরামর্শের জন্যে তাকে ডেকেছেন। সেই সঙ্গে সকল মন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা এবং চিফ ইনস্পেকটর কেলি এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে।

একটি হাই-ব্যাক চেয়ার ছাড়া ঘরের সব চেয়ার ভর্তি। সকলেই এসে গেছেন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। বিজ্ঞানীদের অনেক মিটিং-এ ওকস অংশ গ্রহণ করলেও রাজনীতিকদের সঙ্গে এমন কোনো মিটিং-এ ওকস কখনও বসে নি। মনে মনে সে অস্বস্তি বোধ করছিল।

গতরাত্রে প্রাইম মিনিস্টার জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টি ভি মারফত ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণের শেষে তিনি বলেছেন, জাতির সম্মুখে এ এক নতুন ধরনের বিপদ। এই বিপদ থেকে আমরা কিভাবে উদ্ধার পাব জানি না কিন্তু ডানকার্কের পতনের পর দল মত নির্বিশেষে সমস্ত ইংরেজ জাতি যেমন এক হয়েছিল আজ সেইমতো এক হয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। এখনও জানি না কোন পথে আমরা অগ্রসর হব।

ঘরের ওপরের দিকে একটা দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে কয়েক ধাপ কার্পেট মোড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ হার্বার্ট স্মিথ।

তিনি ঘরে ঢুকতেই গুঞ্জন থেমে গেল। কোনো কোনো মন্ত্রী উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, প্রাইম মিনিস্টার বললেন, আরে বসুন বসুন, দেশ এখন ঘোর সংকটের সম্মুখীন, আজ কোনো ফরমালিটি নয়।

হাই-ব্যাক চেয়ারে বসে তিনি বললেন, শেষ খবর আমি শুনে এলুম, এলি গ্রামে ঐ ব্লাডসাকার বিট্‌ল্‌-এর আক্রমণে একটা শুগার-বিট ফ্যাক্টরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নাইট শিফটের দুজন মাত্র কর্মী এখনও বেঁচে আছে তবে কতক্ষণ বাঁচবে বলতে পারি না।

ওকসের পাশ থেকে একজন বলল, আজ সকালে বি বি সি নিউজ-

বুলেটিনে তো এই খবরটা শুনি নি।

না, খবরটা এখনও প্রচার করতে দেওয়া হয় নি, লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হবে। কেমব্রিজ থেকে মাত্র পনেরো মাইল উত্তরে এলি। দূরত্ব যাই হক বিপদের কথা এই যে গুবরেগুলো এখন আর শুধু কেমব্রিজে আবদ্ধ নেই, তারা দল বেঁধে এগিয়ে চলেছে।

ঘরে মৃদু গুঞ্জন উঠল। বিরোধী দলের নেতা কেনেথ হাণ্ট বলল, যাক বাবা, শয়তানগুলো দক্ষিণ দিকে আসে নি।

হার্বার্ট স্মিথ বলল, আপনি তো দক্ষিণের লোক মিঃ হাণ্ট কিন্তু ওরা উত্তর দক্ষিণ বোঝে না। ওরা যখন নড়তে আরম্ভ করেছে তখন সব দিকেই যেতে পারে। আমরা সারা দেশে পর্যবেক্ষক মোতায়েন করেছি, ইনস্পেক্টর কেলি তাই তো?

হ্যাঁ স্যার, আপাততঃ আমরা সারা ইংলণ্ডে অবজারভার হিসেবে পুলিস এবং ভলানটিয়ার মোতায়েন করেছি কিন্তু এই ব্যাসটার্ড-গুলো···মাপ করবেন প্রাইম মিনিস্টার, শব্দটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

ঠিক আছে ইনস্পেক্টর, শয়তানগুলো সম্বন্ধে এমন মন্তব্য আমরাও করতে পারি, তারপর?

কেলি বলতে লাগল, সব বড় শহরেই অবজারভার বসানো হয়েছে, তিরিশ মাইলের মধ্যে একটা গুবরে দেখা দিলেও আমরা খবর পাব।

লেবার মিনিস্টার হ্যারল্ড আণ্ডারউড জিজ্ঞাসা করল, বেশ কোনো গ্রামে বা শহরে এক ঝাঁক পোকা দেখা গেল, তারপর?

প্রধানমন্ত্রী বললেন, হ্যাঁ তারপর কি করা যেতে পারে তা আলোচনা করবার জন্যেই আজকের এই মিটিং এবং সেই জন্যেই আমরা ব্রিটেনের পুরোধা কীটতত্ত্ববিদ ডঃ ওয়ারেন ওকসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমি শুনেছি ডঃ ডেভিড মাইকেল এই ব্লাড সাকার বিট্‌ল্ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এক প্লেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা যান। ডকটর ওকস তাঁর সহযোগী ছিলেন·

অতএব কিছু বলতে পারেন।

থ্যাংক ইউ প্রাইম মিনিস্টার, স্যার বলতে বলতে ওকস উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। প্রাইম মিনিস্টার তাকে বসিয়ে দিলেন, বললেন আপনি বসে বসেই বলুন।

ওকস বলল: আমি অবশ্যই মাইকেলের সহযোগী ছিলুম কিন্তু ওই বিশেষ বিট্‌ল্ যার ল্যাটিন নাম 'অসিপাস ওলেনস', এটি নিয়ে মাইকেল একা কাজ আরম্ভ করেছিল, কথা ছিল রোম থেকে ও ফিরে এলে আমরা এটি নিয়ে একত্রে কাজ করব সেইজন্যে এ বিষয়ে আমি কি বলব বুঝতে পারছি না।

ঘরের সকলের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হল। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দফতরের মহিলা মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, তা হলে আপনি কি বলতে চান? আপনি কিছুই জানেন না?

কথা তা নয়, শুনুন। গুবরে পোকা সাধারণতঃ রক্ত ও মাংস এমন ব্যাপক হারে ও এত দ্রুত কখনই খায় না। ওরা পোকা-মাকড় খায়। মরা পচা মাছ, টিকটিকি গিরগিটি এই সব খায়।

প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে এগুলো গুবরে পোকা বটে তো?

হ্যাঁ, গুবরে পোকা, আমি অনেকগুলো নমুনা পরীক্ষা করেছি, তবে যে সব গুবরে পোকার কথা বললুম এগুলো সে গুবরে পোকা নয়। আপনি শুনে অবাক হবেন ইংলণ্ডে ন'শো রকমের গুবরে আছে কিন্তু যেটা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা সেটা হল ঐ অসিপাস ওলেনস। ওর একটা ডাক নাম আছে। ডেভিলস কোচ-হস শয়তানের গাড়ির ঘোড়া।

এডুকেশন মিনিস্টার আর্থার স্ট্যানহোপ জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে এই পোকাটাই আমাদের শত্রু? তা কি হতে পারে?

হ্যাঁ, তবে স্যার একটু পার্থক্য আছে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ফলে পরিবেশ দূষিত এ তো আপনারা জানেন,

ব্যাপকহারে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে, নিউ-ক্লিয়ার এনার্জিও ব্যবহার করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে এই নিউক্লিয়ার এনার্জি কোনো ছিদ্র পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে এবং সবার ওপর বন কাটা হচ্ছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক জীবজন্তু পোকা-মাকড় যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তেমনি কিছু নতুন জীব ও কীটপতঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে।

ঘরে আবার গুঞ্জন। প্রাইম মিনিস্টার সকলকে চুপ করতে বললেন। ডঃ ওকস আবার আরম্ভ করলেন। আমি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখেছি যে পাঁচ বছর আগে আমরা যে অসিপাস দেখতে অভ্যস্ত ছিলুম তার সঙ্গে এই অসিপাসের অনেক তফাত। এই অসিপাসের শুঁড় ও ঠোঁট আরও লম্বা ও ধারালো এবং ছুঁচলো, ওরা বেশি দূর পর্যন্ত উড়তে পারে এবং আশঙ্কার কথা যে রক্ত ও মাংস খেতে শিখেছে।

মাই গুডনেস! সেই মহিলা মন্ত্রী স্বগতোক্তি করলেন।

ওকস থামে নি। সে বলল, ঐ ডেভিলস কোচ হর্স-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে টাইগার বিট্‌ল্। সেগুলিও হিংস্র হয়ে উঠেছে। এগুলি কোথাও না কোথাও সৃষ্টি হয়েছে এবং কোনো সুযোগ পেয়ে দ্রুত বংশ বিস্তার করছে।

বিরোধী দলের নেতা কেনেথ হান্ট তখন প্রশ্ন করলেন, শত্রুকে শনাক্ত তো করলেন এখন সমস্যার সমাধান কি?

সকলেই ওয়ারেন ওকসের মুখের দিকে চাইল। ওকস সকলকে নিরাশ করে বলল: হ্যাঁ শনাক্ত করতে পেরেছি বটে তা তো এই সবে মাত্র কিন্তু কোনো সমাধান আমার জানা নেই।

লণ্ডনে যখন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মিটিং হচ্ছিল প্রায় সেই সময়ে আটলানটিকের ওপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের বিখ্যাত ওভাল রুমেও একটি জরুরী মিটিং বসেছে।

লণ্ডনে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের মিটিং অনেক শান্ত, গোলমাল নেই, মিটিং-এ অংশগ্রহণকারীরা নিয়ম মেনে চলেন। মিটিং-এর সময় ধূমপান করেন না।

সে তুলনায় ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের মিটিংটিকে ছাত্রদের কলেজ ইউনিয়নের মিটিং-এর সঙ্গে তুলনা করলে বাড়িয়ে বলা হবে না। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর প্রায় অন্ধকার। যারা মিটিং-এ অংশ নিচ্ছেন তাঁরা প্রেসিডেন্টকে নিজেদেরই সমতুল ভাবছেন, বিশেষ কোনো মর্যাদা দিচ্ছেন। কোনো একজনকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে আর একজন বক্তৃতা আরম্ভ করছেন।

হোয়াইট হাউসের মিটিং-এ সেদিন উপস্থিত আছেন অ্যামেরিকার কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, রাজনীতিক, স্থল নৌ ও বিমানবাহিনীর চীফ এবং বিশেষ আমন্ত্রণে আরও কয়েকজন।

মিটিং আরম্ভ হয়েছে ডিনারের পর। এখন রাত্রি একটা অথচ কোনো সিদ্ধান্ত দূরের কথা একটা কর্মপদ্ধতিও ঠিক করা গেল না। দেখা গেল ঘরের মধ্যে পৃথক কয়েকটা মিটিং আরম্ভ হয়ে গেছে।

এবার প্রেসিডেন্ট মিলটন গারল্যাণ্ড টেবিল চাপড়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন: জেণ্টলমেন প্লিজ, শুনুন, রাত্রি অনেক হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা একটা কার্যধারা ঠিক করতে পারি নি। ইটস গেটিং আস নো হোয়ার।

সকলে চুপ করলেন।

থ্যাংক ইউ, আপনারা শান্ত হয়েছেন। যাই হক আপনারা অনেক কথা বলেছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত আপনারা একজনও একটা সমাধান সূত্র দূরের কথা, আমরা কোন দিকে অগ্রসর হলে এই সংকট মোকাবিলা করতে পারব সে দিকেও কেউ কোনো প্রস্তাব করতে পারেন নি অতএব মিটিং-এর আরম্ভে আমরা যেখানে ছিলুম এখনও সেইখানেই আছি। এটা আপনাদের কৃতিত্বের পরিচয় দেয় না।

সকলে লজ্জায় মাথা নিচু করল।

প্রেসিডেন্ট বলে চলেছেন : আমরা এখানে যতক্ষণ বসে থাকব ততক্ষণে মূল সংকট আরও ঘনীভূত হবে, অবস্থার আরও অবনতি হবে।

প্রেসিডেন্ট ঠিক বলেছেন, একজন কেউ মন্তব্য করল।

প্রেসিডেন্ট বললেন : একজন মিলিটারি অফিসার বললেন, শয়তানের প্রতিমূর্তি পোকাগুলোকে মারবার জন্যে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হক। একজন রাজনীতিক বন্ধু বললেন, এটা কমিউনিস্টদের চক্রান্ত অতএব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হক, একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী বললেন, কিছু করতে হবে না। ও যেমন হঠাৎ এসেছে তেমনি হঠাৎ চলে যাবে। মাথা ঘামাবার বা ভয় পাবার কিছু নেই, প্রকৃতি ঠিক তার কাজ করবে।

প্রেসিডেন্ট একটু কাশলেন তারপর চশমাটা আবার চোখে পরে বললেন : এই ধরনের আলোচনা ও মন্তব্য ছেলেরা ফুটবল ক্লাবের মিটিং-এ করে থাকে কিন্তু আপনারা যে যা বলে থাকুন আমি এই বিরাট দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। কীট নিয়ে গবেষণা করে এমন যত ল্যাবরেটরি দেশে আছে আমি তাদের প্রত্যেককে কাল সকালেই নির্দেশ পাঠাব যে এই নতুন জাতির বিট্‌ল্ তাদের এলাকায় দেখা দিলে তারা যেন এর প্রকৃতি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা আরম্ভ করে দেয় এবং তাদের ফলাফল এখানে ওয়াশিংটনে জানিয়ে দেয়। আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট, যিনি নিজেও একজন খাতনামা বিজ্ঞানী, তাঁকে বলেছি যে এই বিট্‌লের মোকাবিলা করবার জন্যে কালই যেন একটা সেণ্ট্রাল ল্যাবরেটরি চালু করা হয়। ল্যাবরেটরি এই শহরেই চালু হবে। এ বিষয়ে আপনারা কি বলেন?

সকলে প্রায় সমস্বরে বলল, প্রেসিডেন্ট ঠিকই করেছেন।

ছোট একটা খবর। চিকাগো থেকে একজন এনটমোলজিস্ট জানিয়েছেন যে ঐ বিট্‌ল্ তিনি চিনতে পেরেছেন, ওর নাম টাইগার বিট্‌ল্ তবে আমরা নাকি বলি কলোরাডো বিট্‌ল্। এগুলি মোটেই

নিরীহ নয়, শরীরের ভেতর ধারালো শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে রক্ত চুষে খায়, এদের চোয়াল বেশ মজবুত সেজন্যে কুরে কুরে মাংস খেতে পারে, মানুষের পাকস্থলী এদের প্রিয় খাদ্য।

যে বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছিলেন, এ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই, ঝড়ের মতো এসেছে, ঝড়ের মতো চলে যাবে, তিনি বললেন কিন্তু সমস্যার তো সমাধান হল না।

প্রেসিডেন্ট বক্রোক্তি করে তাকে বললেন, বেশ তো সমস্যার সমাধানটা আপনি করে ফেলুন না, কলোরাডো বিট্‌ল্ কিসে মরে বা ব্যাপক হারে তাদের কি করে মারা যায় সেটাই আপনি বার করুন না, পারলে আপনাকে অ্যামেরিকার সর্বোচ্চ প্রাইজ ফ্রাংকলিন মেডাল আপনাকে দোব আর যদি না পারেন তো প্লিজ, বাজে কোনো মন্তব্য করবেন না।

প্রেসিডেন্টের তুল্য গাম্ভীর্য নিয়ে কথাগুলি বলে তিনি ঘোষণা করলেন যে চিকাগো, ডেট্রয়েট এবং গ্রেট লেক এরিয়া তিনি ডিজাস্টার এরিয়া ঘোষণা করেছেন। ইলিনায়স সীমান্তে মিলিটারি পাহারা বসিয়ে দেওয়া কোনো মানুষ বা গাড়ি এপার থেকে ওপারে যেতে দেওয়া হচ্ছে না এবং এই সঙ্গে ঐ অঞ্চলে বিমান চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সর্বনাশ! কেউ একজন মন্তব্য করল।

প্রেসিডেন্ট বললেন, আপাততঃ এই করা হয়েছে। দরকার হলেই অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ মিটিং এখানেই শেষ।

মিটিং শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওভালরুম খালি হয়ে গেল। সব শেষে প্রেসিডেন্ট নিজেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী এবং অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট দু'জনেই জানেন যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া তাঁদের আর কিছু করার নেই।

ক্যাবিনেট রুম থেকে ডঃ ওকস এবং চিফ ইনস্পেক্টর কেলি

বাইরে বেরিয়ে এল। রাস্তায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেস ফটো-গ্রাফারদের ক্যামেরার আলো ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। রিপোর্টাররা ওদের দিকে ছুটে আসছিল। কয়েকজন কনস্টেবল মোতায়েন ছিল, তারা তাদের বাধা দিল। একজন রিপোর্টার চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, ডঃ ওকস, আমরা কি সবচেয়ে খারাপ অবস্থা পার হয়েছি?

কেলি বলল, দয়া করে এখন কোনো প্রশ্ন করবেন না, কাল প্রেস কনফারেন্স ডাকা হবে সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন। এখন কিছু বলা হবে না। ও কে?

সমবেত রিপোর্টারদের কণ্ঠ থেকে হতাশার সুর ধ্বনিত হল। এই ফাঁকে একটা টেলিভিসনের ক্যামেরা কিছু ছবি তুলে নিল।

গাড়িতে উঠে কেলি বলল, এরা সব হুজুগে, চাঞ্চল্যকর খবর পেলে আর কিছু চায় না।

ওকস বলল, চাঞ্চল্যকর? কিন্তু এর চেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর আর কি হতে পারে ইনস্পেক্টর কেলি?

তা যা বলেছেন ডক্টর, কিন্তু কাল প্রেস কনফারেন্সে এদের কি বলবেন?

যীশু জানেন, আমরা তো এখনো পর্যন্ত কিছু করতে পারি নি, আমি আজ রাত্রে ওয়াশিংটনের সঙ্গে কথা বলব, দেখি ওরা কি করছে, হয়তো ওদের কপাল আরও ভাল।

কপাল? মানে লাক?

হ্যাঁ, লাক, বিজ্ঞান যখন কিছু করতে পারছে না তখন লাক ছাড়া আর কি বলতে পারি?

কেলি বলল, তাহলে কি আপনারা হেরে যাচ্ছেন?

হেরে যাচ্ছি? সে কথা বলতে পারি না তবে এই সমস্যা এত দ্রুত এগিয়ে আসছে যে আমরা ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারছি না। সমাধান হয়তো বার করতে পারব কিন্তু ততক্ষণে অর্ধেক পৃথিবী হয়তো ছারখার

হয়ে যাবে এবং তুমি ও আমি ততক্ষণ বেঁচে থাকব কিনা তা বলতে পারি না। তবে আমরা হাল ছাড়ি নি, সবে কাজ. আরম্ভ করেছি, গুবরেগুলোকে জব্দ করার দাওয়াই হয়তো কালই বেরিয়ে যেতে পারে।

কেলি এ কথার কোনো জবাব দিল না। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল, কাঁচের জানলার ওপর টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে। কেলি তাই দেখতে লাগল।

ডঃ ওকস, কেলি এবং স্পেশাল কনট্রোল ইউনিটের আরও কয়েক-জন এই মিটিং এবং পরামর্শ করতে লণ্ডনে এসে ওরা পার্ক লেনে হিলটন হোটেলে উঠেছে। একটা পুরো ফ্লোর ওরা ভাড়া নিয়েছে। ব্রিটিশ সরকার সব ব্যয় বহন করছে।

লিফটে উঠতে উঠতে ডঃ ওকস মস্ত একটা হাই তুললেন। কেলি জিজ্ঞাসা করল, ক্লান্ত ?

শেষ হয়ে গেছি, ওকস বলে।

শেষ হলে চলবে না, কোটি লোকের প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব এখন আপনার হাতে তবে আশা করব ঝড়ের মতো ঐ পোকার ঝাঁক যেমন এসেছে তেমনি ঝড়ের মতো চলে যাবে।

ডঃ ওকস কোনো উত্তর দিল না।

ওকস নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক ছেড়ে বাথরুমে ঢুকল। শরীরটাকে আগে চানকে নিতে হবে, শরীরের ভেতরের সমস্ত কোষগুলো সক্রিয় করে তুলতে হবে, রক্ত চলাচলের স্পিড বাড়ালে তবে কর্মশক্তি বাড়বে। কেলি বলেছিল দুচার পেগ হুইস্কি টেনে নিন ডক্টর দেখবেন এনারজি কাকে বলে। কিন্তু হুইস্কিতে বিশ্বাসী নয়। সে অন্য রাস্তা জানে। প্রথমে সে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। টেমপারেচার কণ্ট্রোল ঘুরিয়ে জলের তাপ বাড়াতে লাগল যতক্ষণ না খুব গরম জল বেরোতে লাগল। যখন সেই গরম আর সহ্য হল না তখন টেমপারেচার কণ্ট্রোল ঘুরিয়ে জল ক্রমশঃ ঠাণ্ডা করতে করতে হিম-শীতল করল। যখন কাঁপুনি ধরল তখন আবার জলের তাপ বাড়াতে লাগল যে পর্যন্ত না শরীর রীতিমতো গরম হল। এইরকম সে তিনবার করল। তারপর

বেশ করে গা মুছে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে একটা স্ল্যাক ও ব্যানলন পরল।

শরীরটা সত্যিই বেশ তাজা লাগল। একজন মিলিটারি অফিসার তাকে কৌশলটা শিখিয়েছিল। এবার গ্লুকোজ মিশিয়ে খানিকটা ব্ল্যাক কফি আর চিজ খাওয়া যাক।

দরজায় নক না করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল ডায়না সিয়ারার। সে স্কু-এর মেম্বার। লণ্ডনের পেস্ট কনট্রোল ইউনিটের সে একজন সভ্য, সেই সুবাদে তাকে স্কু কমিটিতে নেওয়া হয়েছে।

ওকসের সঙ্গে তার আগেই পরিচয় ছিল এবং তার প্রতি ওকসের বেশ দুর্বলতা ছিল। ডায়না সুন্দরী নয়, কিন্তু দেহ তার সুঠাম, মাথা ভর্তি কালো চুল, কালো চোখ। বয়স তেত্রিশ হলেও মনে হয় তেইশ। দারুণ ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস খেলে। দুটোতেই লণ্ডন চ্যামপিয়ন। এদিকে কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ কাজে তার দক্ষতা সর্বজন স্বীকৃত।

বোসো ডায়না, কফি বানাচ্ছি, একটু খাও, লণ্ডনে এসে পর্যন্ত তোমার সঙ্গে তো কথাই বলা হয়নি। তুমি ডক্টরেট পেয়েছ, তোমাকে অভিনন্দনও জানানো হয় নি।

ওসব রাখ তো, তোমাকে তো বেশ তাজা মনে হচ্ছে? পোকা-গুলো ধ্বংস করবার কোনো রাস্তা খুঁজে পেলে নাকি?

এইমাত্র স্নান করে এলুম তো তাই তাজা মনে হচ্ছে আর পোকা জব্দ তো তোমরা করবে, ও তো তোমাদের কাজ। তা কি মনে করে হঠাৎ?

ভুলে গেলে? এখন আমাদের সিকিউরিটি কণ্ট্রোল ইউনিটের একটা মিটিং আছে না, চল কফি খেয়ে মিটিং-এ যাই। কেমব্রিজ থেকে নতুন কিছু খবর এসেছে নাকি?

নতুন আর কি, ঐ ওলি গ্রামের বিট-সুগার ফ্যাক্টরির খবর আর কি। এই যে কফি? চিজ খাবে না চিজ বিস্কুট খাবে?

চিজ বিস্কুট দাও।

কমিটির মিটিং শেষ হল। এরপর লাঞ্চ। কমিটির মেম্বারদের প্রাইম মিনিস্টার লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। একটি ক্লাবে লাঞ্চের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পত্নী মিসেস স্মিথ এবং হোম মিনিস্টার আর্থার নাইট ও মিসেস নাইট লাঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

লাঞ্চের পর প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু ডঃ ওকস, কেলি ও ডায়নাকে ছাড়লেন না। বললেন, তোমাদের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু আলোচনা করব, তোমরা থেকে যাও অবশ্য তোমাদের যদি আর কোথাও না কোনো কাজ থাকে।

প্রাইম মিনিস্টারের অনুরোধ পালন করা উচিত অন্য জায়গায় কাজ থাকলেও।

ক্লাব থেকে নিজের গাড়িতে করে প্রাইম মিনিস্টার ওদের তিন জনকে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে নিয়ে গেলেন। তারপর সকলে মিলে একটা ঘরে বেশ করে গুছিয়ে বসে আলোচনা আরম্ভ করলেন।

প্রাইম মিনিস্টার আরম্ভ করলেন, আচ্ছা ডঃ ওকস আমরা যদি জানতে পারি যে এই বিভীষিকা কিভাবে আরম্ভ হয়েছে তা হলে হয়তো আমরা একটা সমাধান খুঁজে পেতে পারি।

প্রাইম মিনিস্টারের সামনে একটা কৌচে ওকস ও ডায়না এবং কেলি, তিনজনে পাশাপাশি বসে ছিল। ওকস বলল,

প্রাইম মিনিস্টার আমার একটা থিওরি আছে।

কি থিওরি? উৎসুক হয়ে প্রাইম মিনিস্টার জিজ্ঞাসা করেন।

ওকস বলে, এই বিভীষিকা আরম্ভ হয়েছে ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজে এবং অ্যামেরিকার চিকাগোতে। পৃথিবীতে এত দেশ থাকতে এই দুই জায়গায় এই বিভীষিকা আরম্ভ হল কেন? অথচ এমন বিভীষিকা আরম্ভ হওয়া উচিত পৃথিবীর কোনো জলা, বনজঙ্গল ঘেরা অনুন্নত দেশে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, তাই নয় কি?

সত্যিই তো ! এটা তো আমরা ভেবে দেখি নি ? তাহলে ব্যাপারটা কি ? প্রাইম মিনিস্টার তাঁর পাইপটা নামিয়ে রেখে বললেন।

ব্যাপার হল এই দুই জায়গায় দুজন ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হয়েছে, একজন হলেন ডঃ ডেভিড মাইকেল আর অপর জন হলেন মিঃ মরিস উইলিয়ামস।

প্রাইম মিনিস্টার বললেন, এঁরা দুজনেই তো আলপসে প্লেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা গিয়েছিলেন, তাই না ?

হ্যাঁ, আপনার মনে আছে। ওকস বলল।

কবর দেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কটা কি ?

বলছি, ঐ প্লেন অ্যাকসিডেণ্টে মৃত কিছু গিনিপিগ এবং অন্যান্য জন্তুদের আমি পোস্টমর্টম করেছিলুম। ঐগুলি রোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে যাই হক আমি ঐ জন্তুগুলির পেট চিরে মৃত ডেভিলস কোচ হর্স এবং টাইগার বিট্‌ল্ পেয়েছিলুম।

কি করে পেলেন ? গিনিপিগরা তো পোকা খায় না। প্রাইম মিনিস্টার প্রশ্ন করলেন।

আমিও তখন ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিই নি, দিলে বোধহয় ভাল করতুম, হয়তো এই বিভীষিকা সৃষ্টি হত না। বলতে বলতে ওকস একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল। ডায়না ওর হাত চেপে ধরল।

প্রাইম মিনিস্টার সোজা হয়ে বসে বললেন, আপনি বলছেন কি ? গুরুত্ব দিলে কি হত ?

আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার, যে গিনিপিগরা পোকা খায় না। তাহলে শুনুন স্যার। পুরনো গুবরে পোকা থেকে নতুন ও মানুষের পক্ষে হানিকর গুবরে পোকা যে পরিবেশ দূষিত করণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে তারই নমুনা দেখাবার জন্যে ডঃ ডেভিড মাইকেল ঐ দুরকম গুবরে পোকার নমুনা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের দেখাবার জন্যে ওয়ার্ল্ড ইকোলজি কনফারেন্সে রোমে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফেরবার পথে দুর্ঘটনা। ঐ গুবরে পোকাগুলিও আধার ভেঙে বেরিয়ে পড়ে। সংখ্যায়

তখন ওরা অনেক কম ছিল। যাই হক সেগুলি শীত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে এবং আহারের সন্ধানে মৃত পশু ও মানুষের দেহের ভেতরে ঢুকে পড়ে। দেহের মধ্যে পাকস্থলী অংশই ওরা বেছে নেয়। সেখানে ওরা আরামে ছিল এবং বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। প্রচুর ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চাও হয়।

তারপর ?

স্থানান্তরের ফলে বা যে কারণে হক আমার ল্যাবরেটরিতে যে সব পশু এসেছিল এবং তাদের পাকস্থলীতে যে সব গুবরে পোকা ছিল সেগুলি সব মৃত কিন্তু তাদের ডিম ছিল। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে পারত। কিন্তু সেইসব মৃত গিনিপিগ ও অন্যান্য পশুগুলি ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

এরপর ওকস একটু দম নিয়ে বলল, বিমান দুর্ঘটনায় নিহত সব যাত্রীদের দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল ব্যতিক্রম শুধু আমার বন্ধু ডেভিড মাইকেল আর অ্যামেরিকান এনটমোলজিস্ট মরিস উইলিয়মস। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওঁদের স্টম্যাকে নিশ্চয় ঐ বিট্‌ল্ এবং তাদের ডিম ছিল। হসপিটালে যে ডাক্তার ওদের পোস্টমর্টেম করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয় আমার মতো গুরুত্ব দেন নি দিলে হয় তো এই কাণ্ড ঘটত না। ইস্ আমরা কি ভুল করেছি !

প্রাইম মিনিস্টার কি ভাবলেন। তিনি কূটনীতিক। তাঁর মনে নানা প্রশ্ন জাগে। সেই প্রশ্ন নানাভাবে তাঁকে বিচার করতে হয়। এখন তিনি প্রশ্ন করলেন,

তাহলে ডকটর ওকস, আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করব যে আপনি তো ডকটর মাইকেলের সঙ্গে একই সঙ্গে কাজ করতেন তাহলে ডকটর মাইকেল যে এইরকম সাংঘাতিক বিট্‌ল্ নিয়ে রিসার্চ করছিলেন তা কি আপনি জানতেন না।

না, কারণ মাইকেলের ল্যাবরেটরি আলাদা, আমরা অনেক বিষয় নিয়ে একত্রে কাজ করলেও এই বিট্‌ল্ নিয়ে মাইকেল একা কাজ

করছিল। আমারও রোমে যাবার কথা ছিল আমি শেষ মুহূর্তে যেতে পারি নি। যাই হক আমি কালই কেমব্রিজ হসপিটালে সেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করব তিনি সত্যিই মাইকেলের স্টম্যাকে বা বডিতে কোথাও বিট্‌ল্ পেয়েছিলেন কি না তারপর চিকাগোর ডাক্তারকেও চিঠি দোব। আমার ইচ্ছে কবর থেকে মাইকেলের বডি তুলে দেখব। আচ্ছা, চিফ ইনস্পেক্টর কেলি প্রথম অ্যটাক কেমব্রিজে বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে হয়েছিল না ?

হ্যাঁ, ডকটর ওকস, কেলি উত্তর দিল।

প্রাইম মিনিস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ডঃ ওকস নিরীহ বিট্‌ল্ কি করে হিংস্র হল ?

আমরাই সৃষ্টি করি প্রাইম মিনিস্টার, আজ সকালে আপনার ঘরে মিটিং-এ কিছু বলেছি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। নর্থ ইটালিতে একটা বড় ফলের বাগান ছিল। কি হল কে জানে ফলের বাগানের মালিক একদিন বাগান ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন।

বাগানের ফল পেকে মাটিতে পড়তে লাগল। সেই পাকা ফল খাবার জন্যে দলে দলে ইঁদুর আসতে আরম্ভ করল। ইঁদুর শুধু ফল খেয়ে সন্তুষ্ট রইল না, আশেপাশের ক্ষেত খামারের শস্য নষ্ট করতে লাগল। ইঁদুর মারবার জন্যে বিষ ছড়ানো হল। বিষ খেয়ে ইঁদুর মরে, পচে। পচা ইঁদুর খেতে পোকামাকড়ের আমদানি হয়। পোকামাকড় মারবার জন্যে ওষুধ ছিটানো হয়। কিছু পোকা মরে আর কিছু পোকা কীটনাশক ওষুধ হজম করে প্রতিরোধ গড়ে তুলল।

কিন্তু দু'টো কাণ্ড ঘটল। শস্যের পক্ষে উপকারী অনেক কীট ধ্বংস হল অথচ অপকারী অনেক কীট বেঁচে রইল। আর ঐ বাগানে যে ইঁদুরের পাল ফলের লোভে দলে দলে আসছিল সেই ইঁদুরদের খাবার জন্যে বিষধর সাপের আমদানি হল। বিষধর সাপ কিছু মানুষও মারল। সরকার ঐ অঞ্চলে ট্যুরিস্টদের যাওয়া নিষেধ করে

দিলেন। তাহলে দেখলেন তো স্যার, কি ভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং কিভাবে নতুন কীট বা অন্য প্রাণী সৃষ্টি হচ্ছে। এ তো আমি অতি সামান্য একটা উদাহরণ দিলুম আরও কত সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটছে। প্রকৃতির ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হচ্ছে, বলতে কি বিপর্যস্ত।

ডায়না এতক্ষণ চুপ করেছিল, সে মুখ খুলল, আমরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা সত্ত্বেও পৃথিবীর অনেক অনুন্নত দেশ অধিক ফলনের লোভে মাটি পরীক্ষা না করে এমন সব রাসায়নিক সার ব্যবহার করছে যা জমির পক্ষে উপকারী জীবাণু রাজ্যকে ধ্বংস করছে। প্রথম কয়েক বছর ভাল ফলন হলেও পরে আর তা হবে না।

কেলিও বলল, খবরের কাগজেই পড়েছি যে বর্তমানে প্রচুর খাদ্য-শস্য উৎপাদন সত্ত্বেও পৃথিবীতে নাকি কয়েক বছরের মধ্যেই দুর্ভিক্ষ আসন্ন এবং সেইজন্যে সোভিয়েট রাশিয়া বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য কিনে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলছে।

প্রাইম মিনিস্টার বললেন, জনসংখ্যা বাড়ছে, তাদের জন্যে খাবার দরকার অতএব কৃষককে বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে। আমরা যদি পুরনো রীতিতে ফিরে যাই তাহলে শস্য উৎপাদন কমে যাবে, তাহলে ?

ওকস বলল, তাহলে আমি বলব যে নির্বিচারে যেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমরা না যাই।

তাহলে ডকটর ওকস, আপনি বলছেন যে এই যে মারাত্মক বিট্‌ল্ সৃষ্টি হয়েছে এর জন্যে আমরা দায়ী।

নিশ্চয়। আলপসে দুর্ঘটনা স্থল থেকে মাইকেলের যেসব নোট উদ্ধার করা হয়েছিল তাতে আমি এক জায়গায় দেখেছি যে অনেক কীট তাদের দেহে নতুন রসায়ন সৃষ্টি করছে যার ফলে কীটনাশক ওষুধ তাদের মারতে পারে না। আপনি নিশ্চয় জানেন যে ডি ডি টি আজকাল আর মশা মারতে পারছে না ফলে অনেক দেশে আবার

ম্যালেরিয়া ফিরে এসেছে।

তাহলে ডকটর ওকস, আপনি যখন কারণটা জানতেই পেরেছেন তখন আর ডঃ মাইকেলের বডি কবর থেকে তুলে লাভ কি?

লাভ এই যে আমি যেটা বিশ্বাস করছি সেটা প্রমাণ করতে পারব। প্রমাণ করতে পারলে আমি আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে পারব।

পরদিন সকালে প্রেস কনফারেন্স। সাংবাদিকের মধ্যে বিতরণের জন্যে স্কু-এর পাবলিক রিলেসনস অফিসার আগেই একটা হ্যাণ্ড-আউট তৈরি করে রেখেছিলেন এবং সেই হ্যাণ্ড-আউট লণ্ডনের সমস্ত খবরের কাগজের অফিস, নিউজ এজেন্সি, রেডিও, টিভি কেন্দ্র ও বিভিন্ন দেশের বিশেষ লণ্ডনস্থ বিশেষ সংবাদদাতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পরিবেশ কিভাবে দূষিত হচ্ছে এবং যার ফলে নানারকম ক্ষতি হচ্ছে এমন কীটপতঙ্গেরও প্রকৃতি পালটে যাচ্ছে হ্যাণ্ড-আউটে সেই কথাই বুঝিয়ে বলা হয়েছিল। এরকম হ্যাণ্ড-আউট সাংবাদিকদের সাহায্য করে, প্রশ্ন করতেও সুবিধে হয় এবং সংবাদের পশ্চাৎপট রচনা করতেও খুব কাজে লাগে।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স। বেশ ভিড় হয়েছিল। সাংবাদিকরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা প্রশ্নই বার বার করছিল। তারা জিজ্ঞাসা করছিল।

ডকটর ওকস আপনি যা বললেন তা অত্যন্ত ভয়াবহ, এই সংকট যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে মানব সভ্যতা বিপন্ন হবে তাহলে আপনি আমাদের কি আশা দিতে পারেন? আপনারা কতদিনের মধ্যে এই সাংঘাতিক সংকটের মোকাবিলা করতে পারবেন।

ডকটর ওকস স্পষ্ট বললেন, আমরা অবশ্যই চেষ্টা করছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা কিছুই করে উঠতে পারি নি অতএব আমি অন্ততঃ আপনাদের কোনো আশা দিতে পারছি না। তবে আপাততঃ আমার একটা আশা এই যে এই খবর আপনাদের মারফত সারা পৃথিবীতে

ছড়িয়ে পড়বে এবং সেই খবর পড়ে পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো বিজ্ঞানী যদি কিছু আবিষ্কার করতে পারেন বা যদি কিছু তাঁদের জানা থাকে যার দ্বারা আমরা এই মারাত্মক পোকার কবল থেকে মুক্ত হতে পারি।

সেদিন বিকেলে লণ্ডন থেকে কেমব্রিজ ফেরবার পথে গাড়ি করে যাবার সময় ডঃ ওকস ও চিফ ইনস্পেক্টর দেখল কয়েকটি খবরের কাগজের বৈকালিক সংরস্কণ বেরিয়েছে, তাদের হেড-লাইন হল কীট-সংকট সমাধানে বিজ্ঞানী বিফল।

একটা কাগজ প্রথম পাতাতেই একটা কার্টুন প্রকাশ করেছে, একটা টাইগার বিট্‌ল্ শুঁড় বাড়িয়ে তাকে অর্থাৎ ওকসকে কামড়াতে আসছে। ওকস যেন খুব ভয় পেয়েছে। দূরে হতাশ হয়ে প্রাইম মিনিস্টার দাঁড়িয়ে আছেন।

ম্যাঞ্চেস্টারের উপকণ্ঠে নতুন গড়ে ওঠা শহরে আঠারতলা একটা হাই রাইজ বাড়ির সর্বোচ্চ তলে মাল্টি মিলিওনার ব্যবসায়ী ডিউক হলম্যান চার ঘরের একটা ফ্ল্যাট কিনেছে অবশ্যই বেনামে। কারণ এই ফ্ল্যাটখানা হল তার লাভ-নেস্ট, মধুকুঞ্জ।

আটত্রিশ বছর বয়সেই এত ডলার করেছে যে শুধু চারঘরের এই অ্যাপার্টমেণ্টখানা কেন পুরো বাড়িটাই সে অনায়াসে কিনে ফেলতে পারত।

বেডরুমখানা যা সাজিয়েছে না দেখবার মতো। ঘর সাজাতে যে কত হাজার ডলার খরচ করেছে কে জানে। মেঝের কার্পেট, দরজা জানলার পর্দা, খাটের গদি, শোফা কৌচ, এসব তো খুবই দামী তাছাড়া ঘরে আছে একটা ছোট প্রজেক্টর যার সাহায্যে ব্লু ফিল্ম দেখানো যায়। টিভি আছে একটা, দেওয়ালে বড় বড় কামোদ্দীপক ছবি টাঙানো আছে। ঘরের কোণে অছে প্রায় জীবন্ত ভাস্কর মূর্তি, যুবক-যুবতী কামরণে মত্ত। ঘর ঠাণ্ডা গরম করবার ব্যবস্থা তো আছেই।

তারপর আছে নানা দেশের নানা রকম সুরার বোতলে ভর্তি সুদৃশ্য লিকার ক্যাবিনেট। বোতাম টিপলেই দেওয়ালে লুকানো স্টিরিওতে সুমধুর সঙ্গীত মনপ্রাণ ভুলিয়ে দেয়।

ডিউক হলম্যান ইংলণ্ডের অতি সাধারণ ঘরের ছেলে। লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে এক স্টক ব্রোকারের অফিসে এরাণ্ড বয়ের কাজ করত। অফিসের কিছু কাজ করত আর বেশির ভাগ সময় সাইকেল চালিয়ে চিঠিপত্তর নিয়ে যেত।

স্টক-ব্রোকারের অফিসে থাকতে থাকতেই স্টক এক্সচেঞ্জের তেজী মন্দা বাজারের কাজ সে শিখে নিয়েছিল। ছোকরার বরাত খুব ভাল। একদিন ঝোঁকের মাথায় নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে শেয়ার মার্কেটে কিছু টাকা লগ্নী করল। মাত্র তিন দিন পরে সেই টাকা দশগুণ হয়ে ফিরে এল। এবার লাভের অর্ধেক অন্য শেয়ারে লগ্নী করল। এবারও দশগুণ হয়ে ফিরে এল। এরপর থেকে ডিউক আর পিছন ফিরে চায় নি।

এক বছরের মধ্যে সে রীতিমতো ধনী। পরে তো সে শেয়ার বাজারের রাজা নামে পরিচিত হয়েছে এবং হয়েছে রীতিমতো বিত্তশালী। বিয়ে করেছে অভিজাত পরিবারের কন্যা। কিন্তু সে নিজে তো অতি সাধারণ ঘরের ছেলে তাই ধনী বৌ-এর আদব-কায়দার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না।

স্টক ব্রোকারের অফিসে সে যখন এরাণ্ড-বয় ছিল তখন থেকেই নারীর প্রতি তার দুর্বলতা। এখন ধনী হওয়ার ফলে নারী সঙ্গ তার কাছে সহজ হয়েছে। সে সাধারণ ঘরের সুন্দরী যুবতীদের একটা স্টক তৈরি করেছে।

লণ্ডন থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে সপ্তাহ শেষে যাবার সময় যে কোনো একটি মেয়েকে সে তার লাভ নেস্ট-এ নিয়ে যায়। ম্যাঞ্চেস্টারে তাকে কেউ চেনে না। এখানে সে মেয়েটিকে নিয়ে একটা রাত্রি কাটায় তারপর লণ্ডন ফিরে যায়।

লণ্ডনে সে একটি নতুন মেয়ে পেয়েছে নাম শ্যারন। সাধারণ ঘরের মেয়ে, সাধারণ চাকরি করে, ছোট আপিসের ছোট টাইপিস্ট কিন্তু আর একদিকে অসাধারণ। কোনো বিউটি কম্পিটিশনে বিচারকরা যদি পক্ষপাতিত্ব না করে তাহলে রাণীর মুকুট নিশ্চিত শ্যারনের মাথায় শোভা পাবে। এমনই তার রূপ।

এই শ্যারনের যে বয়ফ্রেণ্ড সেও তারই মতো সাধারণ, কোনো একটা কারখানার মেকানিক, মোটর নেই তবে মোটরবাইক আছে। তার বান্ধবী এলেন বোঝায়, তুই এমন সুন্দরী আর তুই কিনা হ্যারির ঘরনী হয়ে জীবনটা বরবাদ করবি? তোর বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে।

কোথাও পাব বড়লোক?

ধরতে হয়, এলেন বলে।

আমি তো বড়লোক ধরতে জানি না, শ্যারন বলে।

ঠিক আছে, চল আজই তোকে বড়লোক ধরিয়ে দোব, এলেন বলে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় এলেন শ্যারনকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যায় এক নামী কিন্তু খুব বড় নয় এমন একটা রেস্তরাঁয় ওরা যেয়ে লাউঞ্জে বসে যেন কারও জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। হোটেলের ওয়েটাররা জানে ওরা শিকার ধরতে এসেছে এবং ওদের মারফত হোটেলের কিছু আয় হয় তাই ওরা আপত্তি করে না।

বেশির ভাগ মানুষ আসে জোড়ায় জোড়ায়। ওদের মনোমত একজনও আসে না। শ্যারন অধৈর্য হয় কিন্তু এলেন তাকে অপেক্ষা করে।

প্রায় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর ওরা দেখল একজন নিজের মোটর থেকে নামল। দামী মোটর, পোশাক দেখে লোকটিকে ধনী মনে হল তবে বয়স কিছু বেশি হয়েছে। তা হক এদের কাছ থেকেই বেশি টাকা বের করা যায়।

ডিউক হলম্যান লাউঞ্জে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এলেন তার মুখোমুখি হয়ে বলল, একি তুমি এত দেরি করলে কেন? সেই কখন থেকে আমি শ্যারনকে নিয়ে তোমার জন্যে বসে আছি, এত

দেরি করলে কেন ?

এ কৌশল ডিউক জানে তাই সে ঘাবড়াল না। সে জানে লণ্ডনের মেয়েরা বা কলগার্লরা আজকাল এইভাবে শিকার ধরে কিন্তু এই মেয়ে দুটিকে তো কলগার্ল বলে মনে হচ্ছে না। কলগার্ল সে নিজে পছন্দ করে না। তবে শ্যারন মেয়েটি তো দারুণ।

ডিউক সহজ ভাবে বলে, সরি ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়েছিলুম, ঠিক আছে, চল শ্যারন ভেতরে যাওয়া যাক, মেরি তুমিও চল।

বিল তুমি আমার নামটা ভুলে গেলে ? আমার নাম এলেন।

সরি এলেন তবে তুমি আমার নামটা ঠিক মনে রেখেছ তো। ডিউক নিজের নাম তো গোপন রাখতেই চায় তাই বিল নামে তার আপত্তি নেই।

ওরা ভেতরে ঢুকল। ভাল ভাল খাবার এল, শ্যাম্পেন এল। শ্যারন বা এলেন অন্য সুরা পান করলেও কখনও শ্যাম্পেন পান করে নি। অত পয়সা ওদের তো নেই-ই ওদের বয়ফ্রেণ্ডদেরও নেই।

এক্সকিউজ মি, আমি একটা ফোন করে এখনি আসছি। বিল অর্থাৎ ডিউক উঠে যায়। সেই ফাঁকে শ্যারন বলল, আরে এলেন লোকটার বাড়িতে নিশ্চয় ওর বউ আছে, তবে ?

ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? লোকটার টাকা আছে। বেশ কিছু দামী উপহার আর টাকা আদায় করে নিজের অবস্থাটা একটু ফিরিয়ে নে, হয়তো ভাল একটা চাকরি পেয়ে যেতে পারিস।

কিন্তু লোকটা যদি ওর পাশে শু'তে বলে ?

ওর গাল টিপে দিয়ে এলেন বলে, আহা নেকু, কিছু জানে না যেন, শু'তে বললে শুবি তবে আগে খেলাবি, আগে একটা হীরের আংটি আদায় করবি, চুপ কর, বিল আসছে।

আরও কিছু আহার, পান ও গল্প হয়। এক সময় এলেন বলে, বিল তোমার একটা টারকিশ সিগারেট দাও তো, আমি এখন উঠি একটা কাজ আছে, শ্যারন তুই আর বিল বোস।

এলেন সিগারেট ধরিয়ে শ্যারনের দিকে চোখ টিপে চলে যায়। এলেন চলে যেতে ডিউক খুশি হয়। একটু পরে শ্যারন টয়লেটে যায়। সেই ফাঁকে আয়নাতে নিজেকে একবার দেখে আসে। মনে মনে বলে ঠিক আছে।

এইভাবে শ্যারনের সঙ্গে ডিউকের আলাপ হয়েছিল। পরের শুক্রবার বিকেলে, শ্যারনকে একজায়গায় অপেক্ষা করতে বলে ডিউক। শ্যারনকে বলে দেয় আমরা বাইরে এক জায়গায় যাব, ফিরব রবিবার বিকেলে।

শ্যারন রাজি হয়। সেদিন রেস্তরাঁ থেকে বাড়ি ফিরে শ্যারন তার হ্যাণ্ড ব্যাগে একটা দশ পাউণ্ড নোট আবিষ্কার করে ছিল সঙ্গে একটা ছোট কাগজে পেনসিলে লেখা ছিল। তোমার বন্ধু এলেনের জন্যে যে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

দশ পাউণ্ড! এলেন অবশ্য শ্যারনকেও ভাগ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্যারন নেয় নি। বলেছিল, তুই তো বিলকে দিয়েছিস তবে আর কেন?

সেদিন শুক্রবার বিকেলে ডিউক শ্যারনকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা ম্যাঞ্চেস্টার চলে এসেছিল। পথে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে শ্যারনকে একটা বিকিনি কিনে দিয়েছিল। হাইরাইজ বিল্ডিং-এ একটা সুইমিং পুল আছে।

ম্যাঞ্চেস্টারে ডিউকের অর্থাৎ বিলের ফ্ল্যাট দেখে শ্যারনের চক্ষু ছানাবড়া। সে ভাবে বিলের এই গুপ্ত ফ্ল্যাটখানা যদি এমনভাবে সাজানো হয়, তাহলে না জানি ওর নিজের বাড়িখানা কেমন সাজানো।

ফ্ল্যাটে কিছুক্ষণ গল্প করে, গান শুনে খুনসুটি করে ওরা বাইরে যেয়ে খেয়ে আসে। ফিরে আসার পর শ্যারনকে 'বিল' অল্প অল্প করে নানারকম সুরা পান করায়। শ্যারনের বেশ একটু গোলাপী নেশা হয়।

বিল বলে, শ্যারন তোমার এই পোশাক ছেড়ে বিকিনিটা একবার পর তো একটু চোখ ভরে তোমাকে দেখি।

শ্যারন সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ফ্রক, ব্রা, পাটি সব টেনে হিঁচড়ে খুলে ফেলে দেয়। বিল, মানে ডিউক লক্ষ্য করে শ্যারনের পায়ের ডিমে একটা স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো ছিল। টেনে হিঁচড়ে প্যাটি খোলবার সময় স্টিকিং প্লাস্টারটা কিভাবে উঠে যায়। সামান্য একটু রক্তও বেরিয়ে পড়ে। সামান্য ঘটনা, ওদিকে কেউ মন দেয় না।

কিন্তু শ্যারনের এই মোহিনী রূপ দেখে ডিউক নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। সে দু হাত দিয়ে শ্যারনকে জাড়য়ে ধরে। শ্যারন বলে আরে ছাড়, বিকিনিটা পরতে দাও কিন্তু ডিউক নিজের ঠোঁট দিয়ে শ্যারনের ঠোঁট চেপে ধরে। শ্যারনও সাড়া না দিয়ে পারে না। সে যে কখন উত্তেজনার বশে ডিউকের পিঠে নখ বসিয়ে দিয়েছে এবং কয়েক ফোঁটা রক্তও বেরিয়েছে তা ওরা দুজনে কেউ লক্ষ্য করে নি।

পরস্পর পরস্পরকে অনেকক্ষণ চেপে ধরে থাকল। তারপর শ্যারনকে মুক্ত করে ডিউক বলল, এস এই শোফাটায় আমরা পাশা-পাশি বসি, একটু গান শোনা যাক।

ডিউক একটা বোতাম টিপতেই সুন্দর সঙ্গীতে ঘর ভরে গেল। শ্যারন বিকিনি পরতে যাচ্ছিল, ডিউক তার হাত ধরে তাকে টেনে পাশে বসাল। বলল, কাল সকালে বিকিনি পরে যখন সুইমিং পুলে যাবে তখন তো তোমাকে দেখতেই পাব, এই তো বেশ আছ। আমিও তো প্রায় অ্যাডাম হয়ে আছি।

শ্যারন দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। ডিউক জিজ্ঞাসা করল ঃ

কি শ্যারন গরম লাগছে? দাঁড়াও, একটু শীতল বাতাস আমদানি করি তার আগে ঘরের গরম হাওয়াটা বার দিই।

শ্যারণ পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আর হাত দুটো পিছন দিকে শোফার মাথায় তুলে দিয়ে সে এলিয়ে বসল। ডিউক কখন সুইচ টিপে দিয়েছে তা সে লক্ষ্য করে নি।

দেওয়ালের গায়ে এয়ার-এক্সপেলার চলল, খুব মৃদু, শোনা যায়

না বললেই হয় এমন একটা মৃদু ঘিন ঘিন ঘিন ঘিন আওয়াজ শ্যারনের কানে এল। আওয়াজ থামল। ডিউক আর একটা সুইচ টিপল। ঘর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করল। শ্যারন আবেশে চুখ বুজল।

চিৎকার করে চেয়ার থেকে শ্যারন হঠাৎ ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পায়ের দিকে চেয়ে দেখল। পায়ের ডিমে যেখানটা কেটে গিয়েছিল সেইখানে একটা কালচে লাল পোকা এঁটে বসেছে, কামড়াচ্ছে, রক্ত চুষছে, বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে যেন একটা বড় ডেঁয়ে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে।

একটা নয়, তার সেই পা পোকায় ভর্তি হয়ে গেছে, অপর পা বেয়েও পোকা উঠছে। ডিউক শ্যারনের চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে তার পা থেকে হাত দিয়ে পোকাগুলো সরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পর-মুহূর্তে নিজেকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল।

তার পিঠে যেখানে শ্যারনের নখরাঘাতে আঁচড় কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল, সেখানে আট দশটা রক্তচোষা বিট্‌ল্ ঝাঁপিয়ে পড়ে শুঁড় বিঁধে রক্তপান আরম্ভ করে দিয়েছে।

এরা কোথা থেকে সার বেঁধে আসছে? চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে ডিউক দেখল দেওয়ালের ওপর দিকে সিলিং-এর নিচে যেখানে এয়ার-এক্সপেলার বসানো আছে সেই এয়ার-এক্সপেলারের ফাঁক দিয়ে বিশ্রী পোকার দল সার বেঁধে নেমে আসছে অত্যন্ত দ্রুত বেগে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পোকাগুলো দু'জনের দেহ প্রায় ঢেকে ফেলল। পোকার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ওরা প্রথমে ঘরে ছোটাছুটি করল, মেঝেতে গা ঘষতে লাগল তাতে দেহের অনেক জায়গা আঁচড়ে গেল তাতে পোকাগুলোকেই প্রশ্রয় দেওয়া হল।

তখন দুজনেই বাথরুমে ঢুকল। শাওয়ারের তলায় জলের স্রোতে পোকাগুলো যদি বেরিয়ে যায় কিন্তু ফল হল বিপরীত। বাথরুমে জল বেরোবার যে কয়েকটা ছিদ্রপথ আছে সেই ছিদ্রপথ দিয়ে আগেই অনেক পোকা এসে বাথরুমে জমায়েত হয়েছিল এখন ওদের

ছেঁকে ধরল।

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে কোনো ফল হল না। পোকাগুলো ওদের আরও বেশি করে কামড়ে ধরল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে অন্য একটা ঘরে ঢুকল। শ্যারন ক্লান্ত হয়ে একটা ডিভানে শুয়ে পড়ল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ডিউকও খানিকক্ষণ ছটফট করে নিস্তেজ ভাবে একটা চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিল। পোকার সার আসছে তো আসছেই। ওদের সারা দেহ ঢেকে ফেলল।

শ্যারনের কান্না কখনই থেমে গেছে। তার কোনো জ্ঞান নেই। ডিউক চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে, নিশ্চল।

শত শত পোকা ওদের রক্ত পান করতে লাগল। শরীরের সব রক্ত নিঃশেষ হলে কুরে কুরে মাংস খাবে।

ষ্টিরিওতে সুমধুর সঙ্গীত বেজেই চলেছে, ঘরগুলোও শীতল হচ্ছে। ওদের মৃত্যুও নেমে আসছে ধীরে ধীরে কিন্তু বলিষ্ঠ পদক্ষেপে।

কেমব্রিজের ১৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই ম্যাঞ্চেস্টার শহরে কেউ ওদের নাম জানে না। দুজনেরই মনে কত উচ্চাভিলাষ। ডিউকের কিছু অভিলাষ যদিও বা পূরণ হয়েছে, শ্যারনের কিছুই পূরণ হয় নি। সে নগ্ন হয়ে পৃথিবীতে এসেছিল এখন আক্ষরিক অর্থেই নগ্ন হয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

সেদিন মিটিং-এর পর যখন চিকাগো ও উপকণ্ঠ থেকে বিট্‌ল্ আক্রমণের অনেক রিপোর্ট আসতে আরম্ভ করল তখন প্রেসিডেন্ট সি আই এ, এফ বি আই এবং ইলিনয়েস স্টেট পুলিসের চিফকে ডেকে বললেন, তোমরা তিনটি সংগঠন মিলে আমাকে একটা রিপোর্ট দাও, কোথায় এর আরম্ভ হয়েছে, কি ঘটছে, জনসাধারণ কি বলছে, সবদিক খতিয়ে দেখে আমাকে একটা রিপোর্ট দাও কিন্তু খবরদার এর মধ্যে তোমরা কোনো রাজনীতি ঢোকাবে না এবং নিজেদের দলাদলি ভুলে যাবে।

আমি চাই নিরপেক্ষ একটি রিপোর্ট। তোমাদের এই তিনটি টিমের ওপর পুরো কর্তৃত্বের ভার দিলুম আমি সি আই এ চিফ হ্যারি ফ্রাই-এর ওপর। হ্যারি যে প্রোগ্রাম তৈরি করে দেবে সেই অনুসারে কাজ করবে তথাপি তোমাদের কারও যদি প্রয়োজন হয় আমাকে ফোন করবে, আমাকে সব সময়ে পাবে।

হ্যারি ফ্রাইকে দেখতে অতি সাধারণ, রোগা, লম্বা, পোশাক অতি সাধারণ। বয়স পঞ্চাশ। পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছে, নানারকম চাকরি করেছে, পড়াশোনা করেছে প্রচুর। বুদ্ধি বিশেষ করে উপস্থিত বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, স্মরণশক্তির তুলনা নেই, ভাষাও কয়েকটা জানে এবং পৃথিবীর সব খবর তার নখ-দর্পণে।

পর পর কয়েকটা ঘটনায় সি আই এ-র বদনাম হয়েছিল। তদানীন্তন সি আই এ চিফ ফ্রাংক ল্যাংলিকে সরিয়ে হ্যারি ফ্রাইকে চিফ করা হয়। ফ্রাই সব দিক সামলে সি আই এ-র বিশ্বাস আবার ফিরিয়ে এনেছে তাই এই দলের নেতা রূপে প্রেসিডেন্ট ওকেই বেছে নিলেন।

প্রেসিডেন্ট আর একজনের কাছেও রিপোর্ট চেয়েছিলেন। ওয়াশিংটনে যে সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি চালু করা হয়েছিল তার ডিরেকটর বেসিল বেনেটের কাছ থেকে একটা বিজ্ঞানভিত্তিক রিপোর্ট চেয়েছিলেন। কলোরাডো বিট্‌ল্ নিয়ে যে সংকট দেখা দিয়েছে বেসিল বেনেট তার একটা মজার নাম দিয়েছে, ব্যাটল্ অফ দি বিট্‌ল্।

রিপোর্ট চাইবার আগে প্রেসিডেন্ট আর একটা কাজ করেছিলেন। তিনি সমস্ত খবরের কাগজ, সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, রেডিও টিভি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেছিলেন বিট্‌ল্ সম্বন্ধে কোনো সংবাদ প্রকাশ না করতে।

অনুরূপ অনুরোধ করে ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিস্টারকেও একখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। প্রাইম মিনিস্টার হাবার্ট স্মিথ যখন টেলিগ্রাম পেলেন তখন ইংলণ্ডের দুটো খবরের কাগজের সান্ধ্য

সংস্করণে খবরটা বেরিয়ে গিয়েছিল।

প্রাইম মিনিস্টার ঘড়ি দেখলেন। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বি বি সি ওভারসিজ নিউজ ব্রডকাস্ট আরম্ভ হবে। তিনি নিজেই বি বি সি এর স্টেশনে ডিরেকটরকে বিট্‌লের খবর প্রচার করতে নিষেধ করলেন এবং এই খবর যাতে আর কোথাও প্রকাশিত না হয় তার ব্যবস্থা করলেন। যেটুকু খবর প্রকাশিত হয়েছিল তা দক্ষিণ ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।

দু'টো রিপোর্টই এসে গেছে। দু'খানা খাম। খামের ওপর লেখা আছে টু দি প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস। তার নিচে লাল কালিতে লেখা আছে ফর ইয়োর আইজ ওনলি। তার নিচে স্বাক্ষর হ্যারি ফ্রাই। অপর খামখানায় বেসিল বেনেট-এর স্বাক্ষর। দু'খানা খামই সীল করা।

প্রেসিডেন্ট প্রথমে হ্যারি ফ্রাই-এর খামখানা খুললেন। রিপোর্ট খুব দীর্ঘ নয় বরঞ্চ সংক্ষিপ্ত, সহজ সরল। রিপোর্ট বলছে ঃ

আমরা এখনও পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ পাই নি যার ওপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে কলোরাডো বিট্‌লের এই ব্যাপক আক্রমণ কোনো দেশ কর্তৃক সৃষ্ট। তা নয়। এ ব্যাপারে কোনো দেশ বা কোনো রাজনৈতিক দল হস্তক্ষেপ করে নি।

আমরা যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি তার ওপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে এই প্লেগ আরম্ভ হয়েছে চিকাগো গ্রেভইয়ার্ডে যেখানে আমাদের বিজ্ঞানী মরিস উইলকিনস ও তার পত্নী মিসেস ক্লেয়ারের কবর দেওয়া হয়েছে। ইটালির রোমে ওয়ার্ল্ড একলজি কনফারেন্স থেকে লণ্ডন যাবার পথে আলপসের ওপর বিমান দুর্ঘটনায় সস্ত্রীক মরিস উইলকিনস এবং সকল যাত্রী মারা যান।

ঐ দুর্ঘটনায় ইংলণ্ডের বিখ্যাত এনটমোলজিস্ট ডঃ ডেভিড মাইকেলও মারা যান। তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। অমরা

ইংলণ্ড থেকে পুলিস রিপোর্ট আনিয়েছি। ডঃ মাইকেলকে কেমব্রিজে কবর দেওয়া হয়েছিল এবং ইংলণ্ডেও কেমব্রিজের কবরখানা থেকে ওই প্লেগ আরম্ভ হয়েছে।

কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতামত যা আমরা পেয়েছি তা এই সঙ্গে যুক্ত করে দিলুম। তার সত্যাসত্য বিচার বিজ্ঞানীরাই করবেন।

আক্রান্ত কয়েকজন জীবিত ব্যক্তি আমাদের বললেন তাঁদের বিশ্বাস কাঁচা রক্ত ও মাংস কলোরাডো বিট্‌লদের আকর্ষণ করে।

হ্যারি ফ্রাই তার রিপোর্ট অহেতুক দীর্ঘ করে নি তবে কয়েকটা বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা দরকার। এই প্রশ্নগুলো হয়তো হ্যারি ফ্রাইয়ের মনে উদয় হয় নি। প্রেসিডেন্ট টেলিফোনের রিসিভার তুলে আবার নামিয়ে রাখলেন। এখন থাক, অনেক রাত্রি হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এবার অপর খামখানা খুললেন। এই রিপোর্টটা পাঠিয়েছে বেসিল বেনেট। হ্যারি ফ্রাই-এর রিপোর্ট যেমন সংক্ষিপ্ত এর রিপোর্ট তেমনি দীর্ঘ।

বেসিল বেনেট লিখেছে পৃথিবীতে মানুষ অপেক্ষা কীটেদের বয়স কয়েক শত কোটি বৎসর বেশি। কত লক্ষ রকমের যে কীট আছে তা আজও জানা যায় নি। তারা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি মজবুত এবং দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে পারে তবে তারা দীর্ঘায়ু নয়। দীর্ঘায়ু হলে মানুষ এখনও পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারত না তবে কালক্রমে কীটেরাই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে, জীবন সংগ্রামে কীটের হাতে মানুষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

ডেভিলস কোচ-হর্স এবং কলোরাডো বিট্‌ল্ যাদের সীমাবদ্ধ আক্রমণেই আমরা এখন শংকিত তারা নৃশংস নরঘাতক, প্রথমেই এই মন্তব্যটি বেসিল বেনেট করেছে। তাদের আয়ত্তে আনবার পথ আমাদের এখনও জানা নেই, পারব কি না তাও জানি না যদিও আমরা অক্লান্ত ভাবে দিবারাত্র চেষ্টা চালিয়ে যাব। আশার বাণী আমি শোনাতে পাচ্ছি না। উক্ত লাইনগুলির তলায় বেসিল বেনেট দাগ দিয়েছেন।

এরপর বেসিল বেনেট কয়েক প্রকার হানিকর এবং সেই সঙ্গে ডেভিলস কোচ হর্স ও কলোরাডো বিট্‌ল্‌দের অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি বুঝিয়েছেন, সঙ্গে ছবিও দিয়েছেন সেই সঙ্গে এদের আহার ও প্রকৃতিও জানিয়েছেন।

তারা কত ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরতে কত সময় লাগে, পূর্ণতা লাভ করতে কত দিন লাগে তাও জানিয়েছেন। প্রতিটি বিট্‌ল্‌ কয়েক শত ডিম পাড়ে এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে তারা কত দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে। রীতিমতো আশংকার কারণ।

পোকাদের দ্রুত বংশ বিস্তারের ডঃ বেনেট কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে ক্যালিফোরনিয়ার কমলালেবু বাগানের একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

কয়েক বছর আগে ক্যালিফোরনিয়ার কমলা লেবু বাগানের প্রায় সমস্ত গাছ কটনী কুশন-স্কেল নামে এক রকম রোগে আক্রান্ত হয় যার ফলে ক্যালিফোরনিয়ার সমস্ত লেবু গাছ শুকিয়ে মরে যেতে থাকে।

বিজ্ঞানীরা কাজে লেগে গেলেন। তারা নানারকম রসায়ন প্রয়োগ করলেন কিন্তু সব ব্যর্থ হল। তখন তারা লেডিবার্ড বিট্‌ল্‌ নামে একরকম গুবরে পোকা ছেড়ে দিলেন।

প্রথমে ছেড়েছিলেন মাত্র ১২৯টা কিন্তু দু'বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছিল যে বিজ্ঞানীদের মনে হয়েছিল এর চেয়েও আকাশের নক্ষত্র গোনা সহজ তবে লেবু বাগিচা কুশন-স্কেল থেকে মুক্ত হয়েছিল।

বেসিল বেনেট মন্তব্য করেছেন যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রকৃতিকে লড়িয়ে দেবার এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ডঃ বেনেট এরপর লিখছেন, পোকা ফসল বা গাছপালা আক্রমণ করলে রাসায়নিক কীটনাশক ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই পদ্ধতি সফল হয়। পোকা মরে যায়, গাছ ও ফসল বাঁচে কিন্তু সেই সঙ্গে সর্বনাশও করে। যেসব গাছে বা ফসলে কীটনাশক ছিটানো

হয়েছে সেই গাছের পাতা বা ফসল খেয়ে অনেক পাখি ও পোকা মরে যায় এমন কি মানুষও নানা রোগে ভোগে অথচ কারণটা জানতে পারে না।

কীটনাশক ছিটানোর ফলে শত্রু পোকাগুলি যেমন মরে তেমনি সেই সঙ্গে শস্যের পক্ষে উপকারী অনেক পোকা ও পতঙ্গও মরে। আবার হানিকর পোকারাও কীটনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এইভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। মানুষ যদি এখনও সতর্ক না হয় তাহলে একদিন তাকে এর মূল্য দিতে হবে।

মাঝে মাঝে কলোরাডো বিট্‌ল্‌রা দল বেঁধে মানুষ ও গবাদি পশু আক্রমণ করছে। দেশ জুড়ে যে সব এনটমোলজিক্যাল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। মানুষ এখনও ব্যাপকভাবে ভয় পায় নি তার কারণ বোধহয় মড়কের খবর ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া হচ্ছে না।

এই কলোরাডো বিট্‌ল্‌ আগে পোকামাকড় খেলেও নররক্ত বা নরমাংস লোভী কখনই ছিল না। হঠাৎ তাদের এই পরিবর্তন কি করে হল তার কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে। কোন দেশে এর সূত্রপাত তাও জানবার চেষ্টা চলছে।

এই পোকাদের নিয়ে ব্রিটেনের ডঃ মাইকেল প্রথমে গবেষণা আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয় তিনি অকালে মারা গেলেন নচেৎ অনেক তথ্য জানা যেত। তাঁর যে সব নোট পাওয়া গেছে তা থেকে এই নৃশংস বিট্‌ল্‌দের প্রথমে কোথায় আবির্ভাব হয়েছিল তার উল্লেখ নেই। তাঁর সহকর্মী ডঃ ওয়ারেন ওকসের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছিল, তিনিও জানেন না।

আমরা মৃত্যুদূত এই পোকাগুলিকে থামাবার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। ব্যাপক হারে কীটনাশক পদার্থ প্রয়োগ করা যেতে পারে কিন্তু সাময়িক কাজ হলেও নতুন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সবচেয়ে আশংকার বিষয় পোকাগুলি যদি কীটনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

শক্তি গড়ে তোলে ? তারা যদি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে ? সে সম্ভাবনা আছে। প্রায় নিরামিষভোজী পোকা যদি আমিষভোজী হতে পারে তাহলে তারা কীটনাশক রসায়নকেও উপেক্ষা করতে পারে। ডঃ ওয়ারেন ওকস এই মত পোষণ করেন। অতএব আমরা স্থির করেছি যে পেস্টিসাইড অর্থাৎ কীটনাশী রসায়ন ব্যবহার করব না।

ঐ ক্যালিফোরনিয়াতেই একবার মেডিটারেনেনা ফ্রুট ফ্লাইয়ের প্রচণ্ড উৎপাত আরম্ভ হয়েছিল। আমরা তখন ঐ জাতীয় লক্ষ লক্ষ পুরুষ মাছি ছেড়ে দিয়েছিলুম কিন্তু ছাড়বার আগে তাদের নির্বীর্য করে দেওয়া হয়েছিল। ল্যাবরেটরিতেই নির্বীর্য ফ্রুট ফ্লাই উৎপন্ন করা হয়েছিল। খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়েছিল। এদের সঙ্গে সঙ্গমের ফলে স্ত্রী মাছিদের ডিম হচ্ছিল না ফলে ঐ মাছির দল নির্বংশ হয়ে যায়। ক্যালিফোরনিয়া বেঁচে যায়।

এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে নির্বীর্য বিট্‌ল্ সৃষ্টি করতে অনেক সময় লাগবে এবং তারপর সেই রকম নির্বীর্য পুরুষ পোকা ছাড়লেও ওদের হয়তো নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে একেবারে নির্বংশ করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। অবশ্য এ পরিকল্পনা বর্জন করা হচ্ছে না তবে সময় সাপেক্ষ।

আর একটা পথ আছে এবং এই পথে আমরা অভিযান আরম্ভ করব। স্ত্রী পোকারা নিজেদের দেহ থেকে একরকম রসায়ন নির্গত করে। যার নাম ফেরমন। ফেরমনের গন্ধ পুরুষ পোকাদের আকর্ষণ করে এমন কি এক মাইল দূর থেকেও। সব পোকাই এই ফেরমন নিঃসরণ করে।

মেরিল্যাণ্ডে মার্কিন সরকারের কৃষি বিভাগের যে গবেষণাগার আছে সেখানকার বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম ফেরমন তৈরি করে তারা গাছের পাতায় ছিটিয়ে দিয়েছিল। দলে দলে পুরুষ পোকা জড়ো হতে থাকে কিন্তু একটিও স্ত্রী পোকা না দেখে তারা বিভ্রান্ত হয়। এই সুযোগে তাদের বিনষ্ট করা সহজ হয়।

আমরা খবর পেয়েছি ব্রিটেনে ডঃ ওকস এখন কৃত্রিম উপায়ে

ফেরমন তৈরি করছেন। যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হলে তিনি একটা পরীক্ষা করবেন। তাঁর পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্ট পেলে আমরাও কাজে নেমে পড়তে পারি।

ইতিমধ্যে আমরা মেয়ে কলোরাডো বিট্‌লের এবং ডেভিলস্ কোচ-হর্স বিট্‌লের ফেরমন পৃথক করতে পেরেছি। আমরা এখন ব্রিটেনের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছি।

আরও একটা উপায় আছে। বাচ্চা পোকাগুলোর ওপর হরমোন ছিটিয়ে দিলে সেগুলি দ্রুত পরিণত হয় কিন্তু আকারে বাড়ে না এবং বেশিক্ষণ বাঁচে না।

নিউইয়র্কের স্টেট এগ্রিকালচার এক্সপেরিমেণ্ট স্টেশন তুলো গাছের শত্রু পোকা এই পদ্ধতিতে ধ্বংস করতে পেরেছে। আবার দেখা গেছে কয়েক রকম এইভাবে না মরলেও তারা বংশ বিস্তারের ক্ষমতা হারিয়েছে।

কলোরাডো বিট্‌লের ওপর হরমোনের প্রতিক্রিয়া কি রকম হবে এখনও বলতে পরছি না। আমরা চিকাগোর আশেপাশে হরমোন ছিটোচ্ছি, এর দ্বারা হয়তো পোকাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে তবে নিঃশেষ হবে কি না এখনও বলার সময় আসে নি। ফলাফলের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।

তবে একটি পদ্ধতি ফলপ্রদ হবে বলে মনে করি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রকৃতিকে লেলিয়ে দেওয়া, পোকা মারবার জন্যে পোকা লেলিয়ে দেওয়া। কোনো হানিকর পোকা ধ্বংস করার জন্যে সেই পোকার রাজ্যে প্যারাসাইট বা পরজীবী জীবাণু বা কীটাণু ছেড়ে দেওয়া।

গত ১৯৫০ সাল থেকে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে পঞ্চাশটি বিভিন্ন জাতির হানিকর কীট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল। কিছু কীট আছে যারা হয়তো গাছপালার ক্ষতি করে কিন্তু অন্য দিকে মানুষের উপকার করে।

যাই হক ডেভিলস্ কোচ-হর্স এবং কলোরাডো বিট্‌লদের কোন্-

প্যারাসাইট মোকাবিলা করতে পারবে সেরকম কোনো প্যারাসাইটের এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নি তবে আমরা উঠে পড়ে লেগেছি, আমাদের এক্সপার্টরা বিষয়টি নিয়ে দিবারাত্রি কাজ করছেন।

তবে আমরা একটা ব্যাপারে সচেষ্ট আছি। আমরা এমন কিছু করব না যাতে মানুষ ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। একটা সমস্যার সমাধান করতে নতুন আর একটা সমস্যার উদ্ভব যেন না হয়।

আমাদের সামনে আর একটা সমস্যা রয়েছে। আমরা জানতে পারছি না যে ঐ বিট্‌ল্‌রা কোথায় তাদের বংশ বৃদ্ধি করছে, কি হারে বংশ বৃদ্ধি করছে এবং ঠিক কোন কোন স্থানে। এটা আমাদের জানা দরকার।

কীটেদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তারা কয়েক পুরুষের মধ্যে পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে বড় জোর কয়েক বছরের মধ্যে। কীটেদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করাও সহজ নয়। তাদের ধ্বংস করবার জন্যে যে সব কীটনাশক রসায়ন প্রয়োগ করা হয় তারা সেগুলি হজম করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে যখন কীটনাশক রসায়ন প্রয়োগ করে তাদের শেষ করা যায় না। উপরন্তু এই সকল রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগে বা পরিবর্তিত পরিবেশে তার নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করতে পারে এবং করেও।

আমরা ল্যাবরেটরিতে মশা ও মাছির ওপর হরমোন কীটনাশক প্রয়োগ করে দেখেছি যে তাদের পনেরো পুরুষের পর কীটনাশক আর কাজ করছে না। তারপর তারা দিব্যি বংশ বিস্তার করে চলেছে।

এই যে গুবরে পোকারা মানুষের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেছে তা যদি ব্যাপক আকার ধারণ করে তাহলে পৃথিবীর বুক হতে মানব-জাতি শেষে হয়ে যেতে পারে।

এখন তো শুধু গুবরে পোকারা অভিযান শুরু করেছে, পরে অন্য পোকারাও অভিযানে অংশ নিতে পারে। তাছাড়া নানা রকম

রোগবাহী পোকামাকড় যথা মশা মাছির সঙ্গে আমরা তো সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি।

আমরা ডেভিলস্ কোচ-হর্স, কলোরাডো বা টাইগার বিট্‌লের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি কিন্তু আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটি সমস্যা।

প্রথমটি হল সময়। ওরা যে হারে দ্রুত বংশ বিস্তার করছে আমরা সেই রকম দ্রুত অগ্রসর হতে পারছি না। আমরা যদি ধ্বংস করবার কোনো পন্থা আবিষ্কার করতে পারি তা যেন বেশি দেরি না হয়ে যায়।

এখন জুলাই মাস। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আমাদের কিছু একটা করতেই হবে। সেপ্টেম্বর মাসে বিট্‌লরা ডিম পাড়বে। সারা শীতকাল সেই ডিম পড়ে থাকবে এবং কোথায় থাকবে তা আমরা জানতে পারব না।

দ্বিতীয় সমস্যা হল বিট্‌লদের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়া। ওদের শুক কীট এত ছোট ও হালকা যে বাতাস অনায়াসে সেগুলি সমুদ্রের পারে যে কোনো দেশে পৌঁছে দিতে পারে।

ডেভিলস্ কোচ-হর্সের একটা বিশেষত্ব হল যে ওরা দ্রুত উড়তে পারে এবং রাত্রে যখন ওড়ে তখন তো দিক ঠিক করাই মুশকিল হয়ে পড়ে।

আমাদের সামনে অনেক সমস্যা। আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছি, এখনও হেরে যাই নি কিন্তু এবার শত্রু পরাক্রমশালী। কি হবে এখনও বলতে পারছি না।

ডঃ বেসিল বেনেটের রিপোর্ট এখানে শেষ হয়েছে। রিপোর্ট শেষ করে প্রেসিডেন্টের কপাল কুঞ্চিত হল।

টেলিফোনে এত জোরে কথা বলার দরকার হয় না কিন্তু চিফ ইনস্পেক্টর কেলির কথা শুনে ডঃ ওয়ারেন ওকস এতদূর উত্তেজিত

হয়েছিলেন যে প্রায় চিৎকার করে বললেন :

কি বললে ? ম্যাঞ্চেস্টার ? ঠিক বলছ তো কেলি ?

ঠিক বলছি মানে ? আমি ম্যাঞ্চেস্টার থেকেই কথা বলছি, আমি এখন ম্যাঞ্চেস্টারে একটা থানায় বসে আছি। রিপোর্ট খুব ভয়াবহ, একটা উঁচু বাড়ির অনেকগুলো ফ্ল্যাটের সবাই মরেছে বিট্‌লের আক্রমণে। যতদূর মনে হচ্ছে বিট্‌ল্‌গুলো ঢুকেছিল বাড়ির এয়ারকুলার চ্যানেলের ভেতর দিয়ে। তবে তাও ঠিক করে বলা যাচ্ছে না।

কেন ?

কারণ বাড়িটার কোনো কোনো অংশে আগুন লেগেছিল, খুব ক্ষতি হয়েছে তাই ঠিক করে বলা যাচ্ছে না কোন পথে বিট্‌ল্‌রা ঢুকেছিল, অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রচুর বিট্‌ল্‌ মরেছে তবে মানুষ যা মরেছে তা সবই বিট্‌ল্‌দের আক্রমণে।

তুমি আমাকে আগে জানাও নি কেন ?

তখন গভীর রাত্রি, আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, জেনেই বা কি করতেন ?

তা ঠিক। ডঃ ওয়ারেন যেন হঠাৎ রেগে গেলেন, বললেন, দূর ছাই, আমরা কি পোকার কাছে হেরে যাব ? কিছুই করতে পারব না ?

কেলি কয়েক সেকেণ্ড জবাব দিল না। ইতিমধ্যে ওকস হয়তো একটু শান্ত হল। কেলি জিজ্ঞাসা করল :

এখন কি ডঃ ডেভিড মাইকেলের বডি কবর থেকে তুলবেন ?

নিশ্চয়, তবে জানি না কি লাভ হবে।

ঠিক আছে, আমি দুপুর নাগাদ কেমব্রিজে ফিরে যাবার চেষ্টা করব, কেলি বলল।

আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব, তখন তোমার কাছে ম্যাঞ্চেস্টারের খবর শুনব। ওকস টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল তারপর মনে মনে, ম্যাঞ্চেস্টার, ম্যাঞ্চেস্টার, বিড়বিড় করে বলতে বলতে একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়ল।

খবরের কাগজে আর কিছু প্রকাশিত না হলেও বা টিভি ও রেডিও

নীরব থাকলেও লোক মুখে খবর বিকৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যাণ্ড ও অ্যামেরিকার বড় বড় শহর থেকে অনেক পরিবার আতঙ্কিত হয়ে মফঃস্বলে চলে যেতে আরম্ভ করল। এরকম চললে মানুষ হয়তো ক্ষেপে উঠবে, বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে।

খবর চেপে রাখা যাচ্ছে না। দু'দিন পরে হয়তো খবরের কাগজও চেপে রাখা যাবে না। ইতিমধ্যে সংবাদ না দিয়েও দু' একটা খবরের কাগজ ডেভিলস্ কোচ-হর্স ও টাইগার বিট্‌লের ছবি ছেপে জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়েছে। ছবির তলায় লিখেছে, এরকম পোকা দেখতে পেলে মেরে ফেলবেন এবং আপনার নিকটস্থ থানায় খবর দেবেন।

যাদের বাড়িতে বাগান আছে বা গরু পুষেছেন তারা সর্বদা দরজা জানালা বন্ধ করে রাখে কিন্তু পোকাগুলো বিভিন্ন পথ বেয়ে আসে। তারা জানালায় নক করে বা দরজায় ঘণ্টা বজিয়ে আসে না। জল-নিকাশী তো আর বন্ধ করা যায় না। ফায়ার প্লেসের চিমনিও বন্ধ করা যায় নি, এছাড়া একটা বাড়িতে অনেক ছিদ্রপথ থাকে। কখন কোথা দিয়ে যে শয়তানদের আবির্ভাব হবে তা কে বলতে পারে।

গ্রেভডিগার হাতে বেলচা নিয়ে নিজের মনে বকবক করছে, এত বয়স হল কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো দিন কবর থেকে লাশ তুলি নি, দিনে দিনে কত কি দেখব? কই মিনিস্টার কোথায় গেলেন, আসুন লাশটা তুলি।

ডঃ ওকস, ইনস্পেক্টর কেলি এবং ডায়না সিয়ারার কবরের কাছে এগিয়ে এল। আসতে আসতে ডায়না জিজ্ঞাসা করল ঃ

তুমি কি উদ্দেশ্যে ডঃ মাইকেলের বডি তুললে?

আমার ধারণা এবং বিশ্বাস প্লেগ এই কবর থেকেই আরম্ভ হয়েছে। মর্গে যে ডাক্তার মাইকেলের পোস্ট-মর্টেম করেছিল সে বলেছে যে ওর স্টম্যাকে অনেকগুলো বিট্‌ল্ ছিল কিন্তু ডাক্তার কোনো গুরুত্ব দেয় নি। আমি যদি এখনও মাইকেলের স্টম্যাকে বা অন্য কোথাও

বিট্‌ল্‌, ডিম বা লারভা পাই তাহলে আমি একটা সূত্র পাব। ডিম পাওয়া গেলে সেগুলো আদি ডিম। তা থেকেই বাচ্চা বেরিয়ে এবং সেই সব বাচ্চা বড় হয়ে বংশ বিস্তার করছে। যাই হক সেই আদি ডিম ও লারভা পরীক্ষা করে কিছু সূত্র আবিষ্কার করতে পারব হয় তো।

ডায়না বলল, তা ঠিক কোথা থেকে কি পাওয়া যায় কে জানে? কেলির মতো ডিটেকটিভরা সামান্য এক গাছি চুল বা এক ফোঁটা রক্ত থেকে সূত্র আবিষ্কার করে খুনীকে ধরতে পারে।

গ্রেভডিগার তার সহকারীর সাহায্যে ডঃ মাইকেলের কফিন তুলে অপেক্ষমাণ একটা ভ্যানে তুলে দিল। ভ্যান কফিনটা পুলিস মর্গে পৌঁছে দেবে। সেখানে ইনস্পেক্টর কেলি, ডঃ ওকস এবং স্কু-এর দু' এক জন মেম্বারের উপস্থিতিতে ডঃ মাইকেলের ডেডবডি কফিন থেকে বার করা হবে ও পরে প্যাথলজিস্ট এবং ওকস স্বয়ং ডঃ মাইকেলের বডি আর এক দফা কাটা-ছেঁড়া করবেন।

ইংলণ্ডের ডারবিশায়ারে ডারবির কাছে একটি ন্যুডিস্ট কলোনি। ইংলণ্ডের কোনো প্রাচীন জমিদারের প্রাসাদ ঘিরে বিশাল এক বাগান। বাগান তো নয়, বড় একটা পার্ক বললেই হয়। সেই বাগানের মাঝখানে সবুজ একটা মাঠ ঘিরে নানারকম গাছ, অ্যাশ, ওক, চেস্টনাট, বার্চ। ছোট একটা স্রোতোস্বিনী গাছগুলির ভেতর দিয়ে কুলুকুলু করে বয়ে গেছে।

জায়গাটি নির্জন, ন্যুডিস্ট কলোনীর পক্ষে উপযুক্ত। প্রাসাদে কেউ বাস করে না। কয়েকজন রক্ষী ও তাদের পরিবার বাড়িটার দেখাশোনা করে। ন্যুডিস্টরা বাগানখানা আলাদা করে ঘিরে নিয়ে তাদের কলোনি বানিয়েছে।

ওরা একটা বাসে করে শনিবার ভোরে আসে। সারাদিন নগ্ন হয়ে উদ্যানে বিচরণ করে। সারাদেহে রোদ লাগায়। উদ্যানেই খাওয়া-

দাওয়া করে। সন্ধ্যার আগে ফিরে যায়। আবার পরদিন রবিবার ভোরে আসে, সন্ধ্যায় ফিরে যায়।

দলের অধিকংশ যুবক-যুবতী, কিছু বালক-বালিকা ও প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া আছে তাদের সংখ্যা কম। নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা চাঁদা দিয়ে যে কেউ সভ্য হতে পারে। শর্ত হল বাস থেকে নেমে গেটের পাশে ড্রেসিং রুমে সমস্ত বস্ত্র উন্মোচন করে উদ্যানে প্রবেশ করতে হবে। উদ্যানে কেউ কোনো রকম আচ্ছাদন ব্যবহার করতে পারবে না। আবার ফেরার সময় ড্রেসিং রুমে নিজ নিজ পোশাক পরে বাসে উঠবে। আর একটি কঠিন শর্ত আছে। সেটি হল নগ্ন অবস্থায় নর ও নারী পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারবে না, যদি কেউ স্পর্শ করে তাহলে তার নাম সভ্যপদ থেকে খারিজ করা হবে।

সেদিনও ওরা ভোরবেলায় বাসে করে এসে পৌঁছেছে। বাস যখন কলোনিতে পৌঁছল তখন সবে সূর্য উঠেছে। গাছের মাথায় রোদ পৌঁছে গেছে। আকাশ নির্মেঘ। ওদের মনে খুব ফুর্তি। সারাদিন রোদ থাকবে। দেহ বেশ ট্যান হবে।

নিরাবরণ হয়ে বাগানে প্রবেশ করে আগে ওরা ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিল। তারপর ওরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে খেলা আরম্ভ করল। কেউ বাস্কেটবল, কেউ ভলিবল আবার কেউ ব্যাডমিন্টন।

যাদের বয়স বেশি তারা তাস বা দাবা নিয়ে বসল আবার কেউ রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে সঙ্গীত শুনতে লাগল। কেউ নিজেকে সূর্যালোকে সমর্পণ করল। হাতে একখানা উপন্যাস।

বেলা হলে নদীতে স্নান করবে। জল গায়েই শুকোবে তারপর লাঞ্চ। লাঞ্চের পর বিশ্রাম। গল্প-গুজব। তারপর চা পান। চায়ের পর আবার এক প্রস্থ খেলা। সন্ধ্যার আগে বাস আসবে। তারপর বাড়ি ফেরার পালা।

এইদিন বেশ জমেছিল। খুব হাসিখুশি হৈ-হল্লা। লাঞ্চের পর বিশ্রাম। বিশ্রামের পর হেলেন নামে একটি অষ্টাদশী মেয়ে একা একা

উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হেলেন হঠাৎ দেখল গাছগুলোর ভেতর দিয়ে ঘন কালো কিসের একটা ঝাঁক যেন উড়ে আসছে। মৃদু একটা আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। মৌমাছির ঝাঁক।

মৌমাছির ঝাঁক তো এত নিচে দিয়ে ওড়ে না এবং আওয়াজও এরকম হয় না। হেলেন অবাক হয়ে দেখতে লাগল। ঠিক এই সময়ে একটি ছেলে ওকে ডাকল। ও ঘাড় ফিরিয়ে তার কথা শুনে আবার যখন সেই ঝাঁক দেখতে যাবে তখন দেখে কোথাও কিছু নেই।

সেই ছেলেটি ওকে বলতে এসেছিল বাগানে ফোয়ারার পাশে দলের কয়েকজন মেয়েপুরুষ নানারকম কসরৎ দেখাবে। কেউ নাচবে, কেউ গান শোনাবে। এইজন্যে সে হেলেনকে ডাকতে এসেছিল।

হেলেন ফোয়ারার কাছে গেল। সকলে এসে গেছে। তিনটি মেয়ে নানা রকম কসরৎ দেখাচ্ছে।

হেলেন এমন একটা জায়গায় বসল যেখান থেকে সেই জায়গাটা দেখা যায় যেখানে গাছের ফাঁক দিয়ে সেই ঝাঁক দেখা গিয়েছিল।

হেলেনের ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল ঝাঁকটা কিসের জানবার জন্যে। তার ধারণা হয়েছিল ঝাঁকটা কতকগুলো গাছকে কেন্দ্র করে সেগুলোর চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরছে। অতএব সেই ঝাঁক আবার দেখা যাবে।

কয়েক মিনিট পরে ঝাঁক আবার দেখা গেল তবে এবার আরও বড় ও ঘন। কিন্তু এবার সেই ঝাঁক অত্যন্ত বেগে তাদের দিকেই ছুটে আসছে, ঠিক যেন মস্ত বড় একটা তীর।

মৌমাছি বা বোলতা নয়। তাদের ঝাঁক এত বড় ও এত গভীর হয় না আর এত জোরেও তারা ধেয়ে আসে না। তবে কি পঙ্গপাল?

হেলেন চিৎকার করে উঠল, দেখ দেখ কিসের ঝাঁক আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। সকলে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল কিন্তু কেউ পালাবার সময় পেল না। এ সেই রক্তচোষা শয়তানের দল। মুহূর্ত মধ্যে ওরা ম্যুডিস্টদের দেহ আবৃত করে ফেলল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যাপক হত্যালীলা শেষ।

ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বাস এল। অন্য দিনের মতো সে হর্ন বাজিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পনেরো মিনিটের মধ্যে ওরা এসে যায়। পনেরো মিনিট পার হয়ে গেল কিন্তু ওদের দেখা নেই।

বাস ড্রাইভার একখানা রগরগে উপন্যাস পড়ছিল তাই সে খেয়াল করে নি। অন্যদিন তার কানে ভেতর থেকে আওয়াজ আসে। আজ তো কোনো আওয়াজই শোনা যায় নি।

ভেতরে যাবার তার হুকুম নেই। তাই সে আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল তারপর বাস থেকে নেমে কাঠের নীরেট গেট খুলে ভেতরে ঢুকল।

এ কি? কি বীভৎস দৃশ্য! বাস ড্রাইভারের বয়স হয়েছে। ভিয়েটনামের যুদ্ধের সময় সে অনেক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখেছে কিন্তু এমন নৃশংস দৃশ্য সে কখনও দেখে নি।

তিরিশ পঁয়ত্রিশজন পুরুষ নারী উলঙ্গ হয়ে পড়ে রয়েছে। কারা দেহের রক্ত ও মাংস কুরে কুরে খেয়েছে। একজন পুরুষের সমস্ত মুখটা খেয়েছে, একজনের পাকস্থলী খেয়েছে, একটি নারীর দুটি স্তনই অদৃশ্য। সে যে কি বিশ্রী ব্যাপার তার বর্ণনা তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

ঐ মৃতের স্তূপ থেকে একটি মেয়ে বুঝি হাত তুলল। তাহলে মেয়েটি বোধ হয় এখনও বেঁচে আছে। ড্রাইভার ছুটে যেয়ে তাকে দু হাত দিয়ে তুলে নিয়ে ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। মেয়েটি সম্পূর্ণ নিরাবরণ সে বিচার সে করল না, মেয়েটির প্রাণ বাঁচানো আগে দরকার।

মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে ড্রাইভার ছুটল থানায়। সেখানে সে খবর দিয়ে একটা বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়ল। এখনি বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

পুলিস হাসপাতালের মর্গ। বেশ বড় একটি হল ঘর। ডঃ ওকস

সার্জনের মতো সাদা এপ্রন ও মুখে মাস্ক পরেছে। ইনস্পেক্টর কেলিও তাই পরেছে।

দুজনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে দুজন কারিগর ভেজা ভেজা কফিনটা খুলছে। ঘরে ফরমালিনের তীব্র গন্ধ। ফরমালিনের গন্ধে কেলি অভ্যস্ত নয়। তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে চোখ মুচছে।

ওকস তাকে বলল বাইরের বারান্দায় একটু ঘুরে আসতে আর ঠিক সেই সময়ে যারা কফিন খুলছিল তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠল। হা ভগবান, এ কি? মানুষ না ভুত?

লোকটির চিৎকার শুনে দু'জনেই কফিনের কাছে ছুটে গেল। প্যাথলজিস্ট আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন এবং কফিনের ভেতরে দৃষ্টিপাত করে মাথা নাড়ছেন, স্বচক্ষে যা দেখছেন তা বুঝি তিনি বিশ্বাস করছেন না।

ওকস ও কেলি যা দেখল তা তাদের দেখতে হবে বলে কখনই তারা কল্পনাও করে নি। ওকস দেখল তার বন্ধুর শুধু কঙ্কালটাই পড়ে আছে। হাড়ের গায়ে কিছু ছাল চামড়া শুকনো রক্ত, পচা মাংস ও চর্বি লেগে রয়েছে মাত্র।

ওকস এখন নিঃসন্দেহ যে মাইকেল নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছিল।

নতুন জাতের ডেভিলস্ কোচ হর্স আর টাইগার বিট্‌লের যে নমুনা সে রোমে নিয়ে গিয়েছিল, দুর্ঘটনার ফলে আধার ভেঙে রক্তচোষা শয়তানগুলো বেরিয়ে পড়ে। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেখানে তখন প্রচণ্ড শীত। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তারা মাইকেল, মরিস উইলকিনস এবং অন্যান্যদের দেহের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সেখানে তারা উত্তাপ ও আহার দুইই পেয়েছিল।

নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে পেট ভরে খেয়েছে এবং ডিম পেড়েছে। উপযুক্ত সময়ে ও পরিবেশে ডিম ফুটে অজস্র বাচ্ছা বেরিয়েছে।

বাচ্ছারা বড় হয়ে হাতের কাছে আগে যে খাদ্য পেয়েছে তা শেষ করেছে তারপর মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে অন্য খাদ্যের সন্ধানে ছুটেছে। ফলে কি হয়েছে তা তো জানাই গেছে।

ডঃ ওকস এবার নিশ্চিত হল যে এই বিভীষিকার উৎপত্তি কেমব্রিজের এই কারখানায়। চিকাগোতেও তাই হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহত বাকি মৃতদেহগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে তাই বিভীষিকা অন্যস্থানে ছড়াতে পারে নি।

ডঃ ডেভিড মাইকেলের দেহের যা অবশিষ্ট ছিল তা কফিন থেকে বার করে টেবিলে শোয়ানো হল। প্যাথলজিস্ট জিজ্ঞাসা করল ঃ

কিছু তো বাকি নেই, কি ডিসেকশন করব? কিন্তু শাদা শাদা এগুলি কি ডঃ ওকস?

কই দেখি? হ্যাঁ ঠিক আছে। ওগুলি ঐ বিট্‌লের ডিম। দেহ থেকে সমস্ত ডিম পরিষ্কার করে বার করে গ্লাস জারে রাখুন। কিছু লার্ভাও পেতে পারেন, সেগুলো আলাদা জারে রাখবেন তারপর বডিতে বেশ করে ফরমালিন ঢেলে দিয়ে কফিনে ভরে দেবেন। আমি ঐ ডিম ও লার্ভা পরে পরীক্ষা করব, কেলি চল, আমরা যাই।

ফেরবার পথে কেলি জিজ্ঞাসা করল, কি বুঝছেন ডঃ ওকস? আমাদের বাঁচবার চান্স কত ভাগ বলে মনে করেন?

এখন কিছুই বলতে পারছি না। তা ছাড়া সমস্যাটা নিয়ে আমি একা চিন্তা করছি না আরও কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী মাথা ঘামাচ্ছেন। আজ শুধু বীভিষিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমরা এখনও অন্ধকারে আছি।

বাকি পথ কেলি আর কোনো প্রশ্ন করল না।

যখন ওরা এনটমেলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে অর্থাৎ বর্তমান স্পেশাল কণ্ট্রোল ইউনিটে পৌঁছল এবং গাড়ি থেকে নেমে ওরা যখন বিল্ডিং-এর ভেতর ঢুকতে যাবে তখন একজন সিকিউরিটি গার্ড এসে ইনস্পেক্টর কেলিকে বলল, স্যার আপনার একটা জরুরী টেলিফোন ছিল,

অপারেটরের কাছে একটু খোঁজ করুন।

কেলি টেলিফোন রুমের দিকে গেল আর ওকস ঢুকল নিজের ল্যাবরেটরিতে বিট্‌ল্‌দের ডিমগুলো পরীক্ষা করবার জন্যে।

কিছুক্ষণ পরে ডঃ ওকস যখন যন্ত্রপাতি আর মাইক্রোস্কোপ নিয়ে বসেছে তখন কেলি ঘরে ঢুকল। তার মুখ ফ্যাকাশে। তাকে দেখেই ওকস বুঝতে পারল নিশ্চয় কোনো দুঃসংবাদ আছে। কেলি বলবার আগেই ওকস জিজ্ঞাসা করল ঃ

কি কেলি ভেবি ব্যাড নিউজ? কোথায়?

ডারবির কাছে একটা ন্যুডিস্ট কলোনিতে। বিকেলে ওদের বাসের ড্রাইভার ওদের ফিরিয়ে আনতে যাবার সময় দেখে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত সৈনিকদের মতো সকলে মরে পড়ে আছে কিন্তু দৃশ্য আরও বীভৎস, থানায় খবর দিয়ে ড্রাইভার ফেন্ট হয়ে গিয়েছিল।

কতজন মরেছে? ওকস জিজ্ঞাসা করে।

চৌত্রিশ জন। দলে ছিল পঁয়ত্রিশ, হেলেন নামে একটি টিন-এজার কোনোরকমে বেঁচে গেছে। তার দুটো পা আক্রমণ করেছিল। হেলেন বলেছে যে চাপ বাঁধা ঘন এক ঝাঁক বিট্‌ল্‌ তীব্র বেগে উড়ে এসে ওদের নিরাবরণ দেহে বসে হুল ফুটিয়ে রক্ত চুষতে আরম্ভ করেছিল। আমার তো কিছুই ভাল লাগছে না, আমরা কি হেরে যাব?

হেরে যেতে পারি। এই রিপোর্টটা পড়। অ্যামেরিকার একজন নামী এনটমোলজিস্ট এটা তাদের প্রেসিডেন্টের কাছে দাখিল করেছে। যা ঘটেছে তার বুঝি তুলনা নেই। পৃথিবীতে মহামারীতে হাজার হাজার মানুষ মরেছে। সেইসব মহামারী ঠেকাবার মানুষ চেষ্টা করেছে, সফলও হয়েছে কিন্তু এ কি? আক্রমণ কোন দিক থেকে আসবে আমরা জানি না এবং এত দ্রুত যে টর্নাডোতেও বুঝি এত তাড়াতাড়ি মানুষ মরে না।

অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট মিল্টন গারল্যাণ্ড ডঃ বেসিল বেনেটের রিপোর্টের একটা কপি ইংলণ্ডের প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট স্মিথের কাছে

পাঠিয়ে দিয়েছিল। মিঃ স্মিথ সেই রিপোর্টের কপিটা ডঃ ওকসকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রিপোর্ট পড়ে চিফ ইনস্পেক্টর কেলি বলল, মাই গড, ডঃ বেনেটের রিপোর্টে কোথাও তো আসার সুর দেখতে পেলুম না। কিন্তু এরকম হওয়ার কারণটা কি ডঃ ওকস?

কেন? ডঃ বেনেট তো তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে না? বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে না? পৃথিবীর জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, সেই জনসংখ্যাকে খাওয়াবার জন্যে নির্বিচারে রাসায়নিক সার আর শস্য বাঁচাবার জন্যে যথেচ্ছ ভাবে পোকামারা ওষুধ ব্যবহার করছি, আকাশে দ্রুতগামী জেট প্লেন চালাচ্ছি যা বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাস নষ্ট করছে। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট তো করছেই উপরন্তু নতুন সংকট ডেকে আনছি যার একটি উদাহরণ হল এই ব্লাডসাকার বিট্‌ল্।

তোমরা বিজ্ঞানীরাই তো এইসব কাণ্ড ঘটাচ্ছ।

একদিক থেকে ঠিক বলেছ কিন্তু আমরা অর্থাৎ জীবন-বিজ্ঞানীর দল যখন দেখলুম যে পৃথিবীর সর্বনাশ হতে চলেছে তখন আমরাই সকলকে সতর্ক করতে আরম্ভ করলুম কিন্তু জনসাধারণ তখন আমাদের বিশ্বাস করে নি, উপরন্তু আমাদের বলেছিল আমরা নাকি মানুষকে ভয় দেখাচ্ছি, এখন আবার তারাই বলছে, আমাদের বাঁচাও, কিছু একটা কর। কিন্তু কি করব? সব তো হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে।

ডঃ ওকস একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ডারবিতে বিট্‌ল্‌দের আক্রমণ দেখে মনে হচ্ছে এবার থেকে ওরা সরাসরি মানুষ ও জীবজন্তুর দেহের ওপর বসবে, রক্ত চুষবে। ওরা এবার শহরে প্রবেশ করবে, ম্যাঞ্চেস্টারে ঢুকে পড়েছে। আর একটু নিচে নামলেই দুটো বৃহৎ শহর পাবে, বার্মিংহাম এবং লণ্ডন এবং একবার প্রবেশ করলে কয়েক দিনের মধ্যে সব শেষ করে দেবে।

কেলি বলল, মন খারাপ করে কি হবে? উৎসাহ কমে যাবে।

কাল তো আমরা ম্যাঞ্চেস্টার যাচ্ছি, দেখা যাক তোমার ফেরোমন এক্সপেরিমেণ্ট যদি সফল হয় তাহলে বিট্‌ল্‌গুলোর বার্মিংহ্যাম ও লণ্ডন প্রবেশ অন্ততঃ সাময়িকভাবে রোধ করতে পারব।

ম্যাঞ্চেস্টারের দক্ষিণে বেশ বড়সড় ঢেউ খেলানো একটা প্রান্তর ফেরোমন এক্সপেরিমেণ্টের জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সেদিন সকাল থেকেই মিলিটারি ও পুলিস জায়গাটা ঘিরে ফেলেছে। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম ফেরোমন তৈরি করেছেন ডঃ ওয়ালটার গ্যাসনার। ডঃ গ্যাসনার অনেক পরিশ্রম করে কিছু স্ত্রী বিট্‌ল্‌ সংগ্রহ করে তাদের দেহ থেকে ফেরোমন সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করে কেমিক্যাল ফরমুলা নির্ধারণ করে কৃত্রিম উপায়ে যথেষ্ট পরিমাণে ফেরোমন পাউডার তৈরি করেছেন।

ডঃ গ্যাসনার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেও দেখেছেন পুরুষ বিট্‌ল্‌রা বেশ দূর থেকে ফেরোমনের গন্ধে আকৃষ্ট হচ্ছে। অন্য কীট নিয়েও তিনি পরীক্ষা করে সফল হয়েছেন।

বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্ত্রী কীট যখন সঙ্গমেচ্ছায় ফেরোমন মোচন করে তখন এক মাইল দূর থেকেও পুরুষ কীটরা ধেয়ে আসে। কীটের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। প্রতি ঘন ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় ফেরোমনের মাত্র তিন হাজার মলিকিউলই যথেষ্ট, অর্থাৎ খুব সামান্য পরিমাণে হলেই চলবে। তবে তখন বাতাস থাকা চাই নইলে সৌরভ ছড়িয়ে পড়বে কি করে?

সাইটে পৌঁছে ওরা এক জায়গায় গাড়ি থেকে নামল। কাছে একটা জিপে একজন আর্মি অফিসার বসেছিল। ইনস্পেক্টর কেলি তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে গেল। ডঃ ওকস অপেক্ষা করতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে কেলি ফিরে এসে বলল, রিপোর্ট ভাল। আপনি ঠিকই বলেছিলেন ডঃ ওকস, কাল সন্ধ্যা থেকেই বিট্‌লের

দল জমায়েত হতে আরম্ভ হয়েছে। হাজার হাজার বিট্‌ল্‌ এসে জি-জি-জি-জি আওয়াজ করতে করতে উড়ে বেড়াচ্ছে।

উড়ে বেড়াচ্ছে মানে মেয়ে বিট্‌ল্‌দের খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাক বাবা, এ রাজ্যের সব পুরুষ বিট্‌ল্‌গুলো এলে বেঁচে যাই।

কিন্তু পুরুষগুলো মেয়েদের খুঁজে পাবে না তখন কি হবে? আমাদের আক্রমণ করবে না তো?

না ওরা ফেরোমোন ছেড়ে আসতে পারবে না, পারলে কাল রাত্রে যেগুলো জমায়েত হয়েছিল সেগুলো এতক্ষণে অন্ততঃ আহারের খোঁজে সাইট থেকে বেরিয়ে আসত। অনাহারে অনেক পোকা মরবে, এতক্ষণে হয়তো মরছেও। এছাড়া ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেও অনেক মরবে। তবে আমাদের তৈরি ফেরোমনের গন্ধ বোধহয় চিরস্থায়ী নয়, গন্ধ চলে গেলে ওরা শহরে ঢুকে যেতে পারে। সেজন্যে আরও পোকা জমায়েত হলেই সবগুলোকে পুড়িয়ে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাইটে যারা এসেছে তাদের প্রত্যেককে সারা দেহ ঢাকা পড়ে এমন ফায়ার প্রুফ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডঃ ওকস এবং কেলিও তেমন পোশাক পরে নিল। তারপর ওরা দু'জন হাতে দূরবীন নিয়ে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়াল।

কয়েকটা হেলিকপটার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সেই সব হেলি-কপটার থেকে ইসেনডিয়ারি বা আগুনে বোমা ফেলে পোকাগুলোকে পুড়িয়ে মারা হবে এবং পরে বিষাক্ত কীটনাশক ছিটিয়ে দেওয়া। একটাও বিট্‌ল্‌ যেন বেঁচে না থাকে।

স্পেশাল ইউনিটের একজন লোক ছুটে এসে বলল, ডঃ ওকস এদিকে এলে দেখতে পাবেন, ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা আসছে।

ওকস ও কেলি স্থান পরিবর্তন করে দেখল, সত্যিই তাই। কিন্তু কি সাংঘাতিক হবে যদি এই বিট্‌লের দল কোনো শহরে প্রবেশ করে তাহলে সব ছারেখারে দেবে।

কর্নেল রবার্ট কাওয়েল মিলিটারি কর্তৃক প্রেরিত। বিট্‌লের পাল

জমিতে ফেরোমনের ওপর বসে পড়লে তাদের ওপর আগুনে বোমা বর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার দায়িত্ব কর্নেলের ওপর দেওয়া ছিল।

পরে যখন বেশ কয়েক ঝাঁক বিট্‌ল্‌ এসে গেল তখন কর্নেল কাওয়েল বলল, ডঃ ওকস এবার আমি আমার কাজ করি?

ডঃ ওকস দেখল অনেক পোকা জমিতে বসলেও অনেক পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে। বোমা বর্ষণের সময় সেগুলো যদি শহরে ঢুকে পড়ে, শহরে ঢুকে না পড়ে যদি যেখান থেকে এসেছিল সেখানে আবার ফিরে যায় তাহলে তো মূল সমস্যা রয়েই গেল।

তাই কর্নেল কাওয়েলকে ওকস বলল, না কর্নেল আর একটু অপেক্ষা করুন।

বেশ আমি আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করব, যাইহক ডক্টর আপনি মাথা ঘামিয়ে আইডিয়াটা বেশ বার করেছেন। এখানে ম্যাঞ্চেস্টারে পোকার বংশ নির্বংশ হবে এবার আমরা কেমব্রিজ ও ডারবিতেও এইভাবে পোকগুলো মারলেই আমাদের প্রবলেম সলভড, সব পোকা শেষ।

ডঃ ওকস কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি তখন চোখে দূরবীন লাগিয়ে পোকার ঝাঁক লক্ষ্য করছিলেন।

আধঘণ্টা পার হতেই কর্নেল কাওয়েল আবার তাড়া দিল, কি ডক্টর আমি এবার অ্যাকশন আরম্ভ করি? আমরা বাপু থিওরিতে বিশ্বাস করি না। অ্যাকশন বুঝি।

কর্নেলের কথা বলার ধরন দেখে ডকটর ওকস বুঝলেন, লোকটিকে আর থামানো যাবে না তাই তিনি বললেন যা ভাল বোঝ কর।

ডঃ ওকসের সম্মতি পেয়ে কর্নেল তখনি আদেশ জারি করলেন। আট দশটা হেলিকপটার সমস্ত প্রান্তরটার বিভিন্ন জায়গায় পজিশন নিয়ে একযোগে বিষাক্ত কীটনাশক স্প্রে করল। যে সব পোকাগুলো উড়ছিল সেগুলো সব জমিতে পড়ে গেল। আশ্চর্য যে হেলিকপটার-গুলো সমগ্র প্রান্তরটা ঘিরে এমন কায়দা করে স্প্রে করল যে একটাও

পোকা প্রান্তরের বাইরে আসতে পারল না।

সব পোকা জমিতে পড়ে যাবার পর হেলিকপটার থেকে আগুনে বোমা বর্ষিত হল প্রচুর পরিমাণে। পঁচিশ মিনিটে অপারেশন শেষ।

অপারেশন শেষ করে কর্নেল হাস্যমুখে ডঃ ওকসের দিকে এগিয়ে এসে বলল, কি ডক্টর, সন্তুষ্ট তো? তাহলে এবার তুমি কেমব্রিজ আর ডারবির জন্যে ডেট ঠিক কর, ওখানেও শয়তানদের ডিপো আছে। ম্যাঞ্চেস্টারের মতো ও দুটো ডিপো শেষ করে দিলে শয়তানরা নির্বংশ হবে না ডক্টর?

তুমি জান না কর্নেল, এগুলো কতদূর ডেঞ্জারাস আর কি সাংঘাতিক রেটে মালটিপ্লাই করতে পারে, যতক্ষণ একটা মেল আর একটা ফিমেল বেঁচে থাকবে ততক্ষণ পৃথিবী নিরাপদ নয়।

তাহলে কেমব্রিজ আর ডারবিতে আপারেশন হবে না?

সেটা আমরা তোমাকে পরে জানাব। আমরা আজই রাত্রে মিটিং-এ বসব।

যাইহক সেদিন মিটিং-এ সাব্যস্ত হল যে কেমব্রিজ এবং ডারবিতেও একই অপারেশন হক, ফেরোমন এক্সপেরিমেণ্ট করা হক। মনে হচ্ছে তার দ্বারা আপাততঃ শয়তানগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে।

কয়েকদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে শয়তানদের মারবার জন্যে অ্যামেরিকায় চিকাগো এবং কয়েকটি জায়গায় ফেরোমন এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে কিছু রক্তচোষা শয়তান খরচ করা হয়েছে। অ্যামেরিকায় কলোরাডো বিট্‌ল্‌দের জন্যে ফেরোমন ফর্মুলার সামান্য হেরফের করতে হয়েছিল।

ফেরোমন সাহায্যে পুরুষ বিট্‌ল্‌গুলোকে হত্যা করার কাজটা সফল। অনুরূপ ভাবে স্ত্রী বিটল্‌গুলোকে কোনোরকমভাবে এক জায়গায় আকৃষ্ট করে জমায়েত করা যায় কিনা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। ইংলণ্ড ও অ্যামেরিকা উভয় দেশই এই গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছে। এই সঙ্গে ওদের ধ্বংস করার জন্য অন্য

গবেষণাও চলছে।

তিন দিন পরে প্রাইম মিনিস্টার স্বয়ং তদারক করতে স্পেশাল কণ্ট্রোল ইউনিটে এলেন। মিঃ হার্বার্ট স্মিথ খুব সাধারণ। নিয়মকানুন সব সময় মেনে চলেন না। নিজেই গাড়ি চালিয়ে ল্যাবরেটরিতে চলে এসেছেন।

মিটিং রুমে সকলে জমায়েত হলে ডঃ ওকসকে বললেন, আমি আজ প্রেসিডেন্ট মিল্টন গারল্যাণ্ডের সঙ্গে কথা বলছিলুম। প্রেসিডেন্টকে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ডঃ বেসিল বেনেট বলেছেন যে ফেরোমন এক্সপেরিমেণ্ট করে আমরা বৃথাই কালক্ষেপ করছি, মূল সমস্যা রয়েই গেছে। আপনি কি বলেন ডক্টর ওকস।

প্রাইম মিনিস্টার, স্যার, আপনি আমাকে ওয়ারেন বলবেন, আপনার ছেলে ইউনিভার্সিটিতে আমার ক্লাসমেট ছিল।

বেশ ওয়ারেন, তোমার কি মত আমাকে বল।

ডঃ বেনেট ঠিকই বলেছেন। মূল সমস্যা সমাধানে আমরা এখনও কিছু করে উঠতে পারি নি। আমিও মাঝে মাঝে ডঃ বেনেটের সঙ্গে ফোনে কথা বলি। লাখ লাখ মেল বিটল মরলেও ফিমেল বিটলগুলো রয়ে গেছে, তাদের ডিম এবং লারভাও রয়েছে অতএব এখন পর্যন্ত আমরা যেখানে ছিলুম সেখানে রয়েছি।

ডঃ ওকসের এই মন্তব্যের পর ঘরে একরকম অস্বস্তিকর নীরবতা সঞ্চারিত হল। মেম্বাররা গম্ভীর মুখে নিজেদের অসহায়তা উপলব্ধি করতে লাগলেন। কর্নেল কাওয়েল যে খুব কথা বলতে ভালবাসে এবং কখনই নিরুৎসাহ হয় না সেও যেন মুষড়ে পড়ল। নীরবতা ভঙ্গ করে চিফ ইনস্পেক্টর কেলি প্রশ্ন করল: যে উপায়ে আমরা ম্যাঞ্চেস্টার, কেমব্রিজ ও ডারবিতে শয়তান কীটদের ধ্বংস করলুম সেই উপায়ে আমরা যদি সমস্ত পুরুষ শয়তানগুলো ধ্বংস করতে পারি···।

সমস্ত পুরুষ কীট? কি বলছ তুমি কেলি? সে কি সম্ভব? তবে আমরা আপাততঃ কয়েকটা দিন সময় পেয়েছি, ওদের নিয়ন্ত্রণে

আনতে পেরেছি এবং আর একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে ওরা এখন বড় ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। তবে ওদের পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করতে হলে ওদের উৎস খুঁজে বার করতে হবে। মূল উৎস ছিল এখানে কেমব্রিজ আর অ্যামেরিকায় চিকাগো কিন্তু এখন দেখছি ওদের একাধিক উৎস ক্ষেত্র আছে।

ডঃ ওকস দেওয়ালে টাঙানো ম্যাপের কাছে উঠে গেল। তারপর কয়েকটা জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বলল ওদের গতিবিধির যেন একটা হদিশ পাওয়া যাচ্ছে।

একজন প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনি বলতে চাইছেন যে আবহাওয়ার খবরে যেমন বলা হয় কোন দিক থেকে ঝড় আসবে, তেমনি আপনি বলতে পারবেন কোন দিক থেকে ডেভিলস কোচ-হর্সেব ঝাঁক আসবে বা কোনদিকে যাবে ?

ডঃ ওকস হাসলেন। তিনি বললেন, অত ব্যস্ত হবেন না। আমরা প্রথমে দেখেছি কাঁচা রক্ত মাংসের গন্ধে দুচারটে করে বিটল্ আসতে আসতে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছে কিন্তু ডারবিতে ন্যুডিস্ট কলোনিতে দেখা ওরা আক্রমণের ধারা পালটেছে, ঝাঁক বেঁধে এসে জমায়েত হওয়া নরনারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ডারবিতে কাঁচা রক্তমাংসের প্রশ্ন ছিল না। তারা তাজা রক্তমাংসওয়ালা মানুষকে আক্রমণ করেছিল। এরপর আমরা তিন জায়গায় ফেরোমন এক্সপেরিমেণ্টের সময় দেখেছি ওরা ঝাঁক বেঁধে আসছে এবং আমার আশংকা ওরা এবার ঝাঁক বেঁধে আমাদের শহরের মানুষদের আক্রমণ করবে।

কর্নেল রবার্ট কাওয়েল বলল, তাহলে আমবা কাছাকাছি কয়েকটা শহরে আমাদের হেলিকপটার ইউনিট নিয়ে প্রস্তুত থাকি, ওরা ঝাঁক বেঁধে এলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। ওয়ারের সময় যেমন আগুনে বোমা নিবিয়ে ফেলার জন্যে স্টিরাপ পাম্প বিলি করা হয়েছিল তেমনি এবার শহরে কীটনাশক ছিটোবার জন্যে স্প্রে-গান বিলি করা হক। শয়তানগুলোকে দেখা গেলে স্প্রে-গান থেকে কীটনাশক ছিটানো এবং

তারপর তো আমরা আছি, প্রাইম মিনিস্টার স্যার কি বলেন ?

আপাততঃ অত স্প্রে-গান বা অত পরিমাণ কীটনাশক আমাদের মজুত নেই তবে যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে কিছু করতে চান তা করতে পারেন।

একটু থেমে প্রাইম মিনিস্টার বললেন, ততদিন কি কর্নেল কাওয়েল ক্রিকেট ম্যাচ বা ফুটবল ম্যাচ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেবেন এবং সিনেমা থিয়েটার ইস্কুল কলেজ ?

ডঃ ওকস বললেন, এভাবে হয়তো কিছু পোকা মারা যাবে কিন্তু ব্লাডসাকারের বংশ নির্বংশ করা যাবে না। সমস্যা কর্নেল কাওয়েল যা মনে করছেন তার চেয়েও অনেক গভীর।

আর একজন বললেন, তাহলে ওরা আক্রমণ আরম্ভ করার আগেই ওদের আমাদের শেষ করতে হবে নইলে নিস্তার নেই। কয়েকদিন আক্রমণ বন্ধ আছে না ?

পুরোপুরি নয় অবশ্য তবে এই সময়টায় ওরা ডিমে তা দেয়। শীগগির নতুন বাচ্চা বেরাবে। বাচ্চাগুলো জন্মেই শিকারী বনে যায়। পরবর্তী আক্রমণ কোথায় হবে তা আমরা জানি না। তবে দেরি নেই।

সেদিন মিটিং এখানেই শেষ হল।

বেশ কয়েকটা দিন পার হয়ে গেছে। দিবারাত্র পরিশ্রম করে ডঃ ওকস রীতিমতো ক্লান্ত।

ডঃ ডেভিড মাইকেলের সেই নোটগুলো সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত পর পর খুঁটিয়ে পড়ল। সেগুলি থেকে নানারকন নোট তৈরি করল তারপর কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে সব হিসেব-নিকেশ করল কিন্তু কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। রাত্রি তখন বারোটা।

ক্লান্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে বারান্দায় বসে কি চিন্তা করতে লাগল।

এমন সময় বাইরে দরজায় কে নক করল। ওকস ভাবল বুঝি ডায়না এসেছে তাই সে উঠে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দরজা খুলে দেখল, একজন সিকিউরিটি গার্ড।

গার্ড বলল, এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করছি, আমাকে ক্ষমা করবেন, মিস শিয়ারার বললেন আপনি নাকি এখনও জেগে আছেন, একজন যুবক আপনার সঙ্গে এখনি দেখা করতে চায়, বলছে খুব নাকি জরুরী, তার সঙ্গে আপনার নামে প্রফেসর গর্ডন হারভেলের পরিচয়-পত্র আছে।

প্রফেসর গর্ডন হারভেল! নামটা স্মরণ করে ওকস একটু ভ্রূকুটি করলেও কিছু বলল না কারণ প্রফেসর হারভেল তার শিক্ষা গুরু এবং তার অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র, তিনি যখন পাঠিয়েছেন তখন নিশ্চয় খুব জরুরী।

সিকিউরিটি গার্ড বলল, যুবকটি বলছে সে নাকি গাড়ি চালিয়ে ল্যাংকাস্টার থেকে আসছে।

ছিটগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে?

না স্যার তা নয়, বেশ সজ্জন ও বুদ্ধিমান বলে মনে হল, এই যে স্যার প্রফেসর হারভেলের চিঠি। চিঠিখানা আপনাকে দেবার জন্যে আমাকে দিয়েছে।

ঠিক আছে, ডেকে আন।

কয়েক মিনেট পরে সিকিউরিটি গার্ড একটি ছোকরাকে নিয়ে এল। গার্ড ঠিকই বলেছিল, ছোকরাকে দেখে বুদ্ধিমান ও মার্জিত মনে হয় তবে একটু নার্ভাস মনে হচ্ছে। সেটা হতে পারে। এত রাত্রে একজনের বাড়ি এসেছেন, তিনি যদি ধমক দেন?

গার্ড বলল, মিঃ জন ডেভিস।

ওকস ঈষৎ হেসে, প্লিজ টু মিট ইউ, বলে হাত বাড়িয়ে দিল। জন ডেভিস থতমত খেয়ে গেল। এমন সাদর আমন্ত্রণ সে আশা করে নি তাছাড়া তার ডানহাতে ছিল একটা অ্যাটাচিকেস। হাজার হক

বুদ্ধিমান ছেলে তো তাই অ্যাটাচিকেসটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ডঃ ওকসের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে বলল, এতরাত্রে আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এজন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার।

ঠিক আছে জন, তুমি বোসো। তোমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে, কিছু কফি তৈরি করি। তাহলে স্যার খুবই ভাল হয়, ধন্যবাদ।

কয়েক মিনিট পরে ওকস কফি তৈরি করে নিয়ে এল। কফির জার ও মগ নিয়ে ওরা ঘরে এসে বসল। ওকস বলল ঃ

নাও জন, আরম্ভ কর, কি বলবে বল।

হ্যাঁ, আমি প্রফেসর হারভেলের একজন ছাত্র, তাঁরই অধীনে কিছু গবেষণা করছি এবং একটা কলেজে পড়াই, জুনিয়র লেকচারার। আমি শুনেছি এই যে ভেভিলস কোচ-হর্স আর টাইগার বিটল্‌রা যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে আপনি এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী তার মোকাবিলার চেষ্টা করেছেন। তা ডঃ ওকস এই সমস্যার মোকাবিলা করা যেমন আর্জেন্ট তেমনি জটিল, আমি আর কি বলব, আপনি তো সমস্যাটাকে প্রত্যক্ষ করছেন, আমার চেয়ে অনেক ভাল বোঝেন।

ওকস ভীষণ ক্লান্ত, এখন একটু হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারলে বেঁচে যায়। এই ছোকরা যদি এখন বকবক করতে আরম্ভ করে তাহলে তো ঘুমের দফারফা? তাই সে বলল ঃ

দেখ মিঃ ডেভিস, আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত, সারাদিন খুব পরিশ্রম করতে হয়। এখন আমি ক্লান্ত, তুমি কি এই বিটল সমস্যা নিয়ে গল্প আরম্ভ করবে?

না না, ডঃ ওকস, আমার গল্প করার একটুও ইচ্ছে নেই। আমি অনেক আগে পৌঁছতে পারতুম কিন্তু পথে আমার গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেল, না না এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করার মতলব নেই।

ওকস ভাবে, একে নিয়ে পারা যায় না। আবার সেই ধানাই-পানাই আরম্ভ করল। এবার সে বিরক্ত হয়ে বলল ঃ

যা বলবার সোজাসুজি বল, কাম স্ট্রেট টু দি পয়েন্ট।

পয়েন্ট? হ্যাঁ, আমি তো আপনাকে বলেছি যে আমি প্রফেসর হারভেলের ছাত্র, ল্যাংকাস্টার ইউনিভারসিটিতে বায়োলজি ডিপার্টমেন্টে আমি প্রফেসরের অধীনে রিসার্চ স্কলার। আমরা আপনাদের এই কেমব্রিজের মতো ওখানেও এই বিটল প্রবলেম নিয়ে কাজ করছি, এজন্যে আমরা কমপিউটারের হেলপ নিচ্ছি।

বেশ করছ, আমি তোমাকে একটা টেপ-রেকর্ডার দিয়ে যাচ্ছি, তোমার যা বলবার রেকর্ড করে রাখ, আমি এখন ঘুমোতে চললুম, কাল সকালে টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে শুনব। তুমি বাকি রাত্রিটা ঐ শোফায় আরামে ঘুমোতে পারবে আশা করছি।

কথা শেষ করে ওকস গমনোদ্যত হল।

দাঁড়ান ডঃ ওয়ারেন, যাবেন না, আমি সংক্ষেপে বলছি। আমরা আপনার ইনস্টিটিউ থেকে দু'রকম বিটলের স্পেসিমেন চেয়েছিলুম তা আমাদের মৃত পোকা পাঠান হয়েছিল, ওতে আমাদের কাজ হয় নি তাই আমরাই উদ্যোগী হয়ে কেমব্রিজে লোক পাঠিয়ে কয়েকটা জীবন্ত বিটল সংগ্রহ করেছি অবিশ্যি আমরা খুবই সতর্কতার সঙ্গে পোকাগুলি সংগ্রহ করেছিলুম, কড়া নজর রেখেছিলুম সংগ্রহের সময় আমাদের শরীরে কোথাও কেটে না যায়।

ওকস স্তম্ভিত। হায় এরা জানে না পোকাগুলো বিষাক্ত সাপের মতো বিপজ্জনক। ভাগ্যিস কেমব্রিজে স্পেসিমেন সংগ্রহ করেছে, ডারবিতে হলে আর দেখতে হত না।

জন ডেভিস বলল: আমরা তাদের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তৈরি করলুম, তাদের রক্তমাখা মাংসের টুকরো খাইয়ে বড় করতে লাগলুম। এরা খুব দ্রুত গতিতে বংশ বিস্তার করতে পারে। যাই হক আমরা ওদের কেটেকুটে ও নানা পরিবেশে রেখে পরীক্ষা করতে লাগলুম।

তা কি পেলে?

কিছু না কিন্তু তারপর একটা দুর্ঘটনা ঘটল। এমন দুর্ঘটনা এবং

আমাদের অনুকূলে, ঘটে না। আমাদের শহরের পাওয়ার হাউসে ব্রেক ডাউন। সারা শহর অন্ধকার। দু'তিন দিন শহরে আলো জ্বলবে না, হিটার জ্বলবে না, ল্যাবরেটরির অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট নিষ্কর্মা হবে এবং আমাদের ফ্রিজও নিষ্কর্মা। পোকাদের খাওয়াবার মাংসও নেই। বাজারেও মাংস নেই। বিটলগুলোকে খাওয়াতে হবে তাই ওরা স্বভাবত যা খায় আমরা তাই দিলুম, কিছু বিটগাজরের টুকরো আর কিছু পোকামাকড়। সে খাবার ওরা খেল না, না খেয়ে মরতে লাগল।

গুড গড! নিশ্বাস বন্ধ করে ওকস বলল, তারপর?

আমি তখন চিন্তা করতে লাগলুম তাহলে কি বিট-গাজর ওদের মৃত্যুর কারণ? রক্ত আর মাংস ওদের বাঁচিয়ে রাখে? তাহলে মাংসর কোনো খাদ্যসার যা সব্জিতে নেই, তা ওদের বাঁচিয়ে রাখে? অথবা সব্জিতে এমন কিছু আছে যা খেয়ে ওরা মরে? সেটা কি? আমি নানারকম খাদ্য বিশ্লেষণ করতে থাকি আর বিটলদের খাওয়াতে থাকি। কোনো হদিশ পেলুম না।

জন ডেভিস উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল। পায়চারি করতে করতে ক্লাসে লেকচারের ভঙ্গিতে জন ডেভিস বলতে লাগল, সবজি খাইয়েছি এমন কয়েকটা পোকার ডিম পরীক্ষা করে দেখলুম সে ডিমে প্রোটিন বা ভিটামিন নেই, তাই সেই ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরোয় সে বাচ্চা বাঁচে না।

ওকস ভাবল সেও তো ডিম সংগ্রহ করে সেগুলি পরীক্ষা করেছে। সেই পোকাগুলি সবজি খাওয়া পোকা নয়। তারা মানুষের রক্ত মাংস খেয়েছিল তাই তাদের ডিমে প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদি ছিল কিন্তু একটা অ্যাকসিডেন্ট জন ডেভিসকে সাহায্য করেছে। অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে এমন অ্যাকসিডেন্টের অবদান আছে।

আমার কথা এখনও শেষ হয় নি ডঃ ওকস, বিটলগুলো তাদের খাদ্যাভ্যাস বদল করেছে, তারা তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে প্রোটিন

ও ভিটামিন সংগ্রহের উদ্দেশে জীবজন্তু ও মানুষকে আক্রমণ করেছে। কয়েকটি তথ্যের মধ্যে এই কটি তথ্য আমি···।

তাহলে আরও কিছু তথ্য তুমি পেয়েছ?

হ্যাঁ, কিছু পেয়েছি বা বলতে পারেন আবিষ্কার করতে পেরেছি হয়তো।

খুব বিনীত স্বরে এবং কাঁপা কাঁপা গলায় ছেলেটি কথাগুলি বলল।

কি পেয়েছ?

আমি কিছুদিন থেকে ভাইরাস নিয়ে কাজ করছিলুম এবং আপনি জানেন প্রফেসর গর্ডন হারভেল ভাইরোলিজিতে একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। আমি তখন ভাবলুম যে সবজিখাওয়া দুর্বল বা মৃত দেহ থেকে কোনো ভাইরাস পাওয়া যায় কিনা যা বিভীষিকা সৃষ্টিকারী বিটল-রাজ্যে মড়ক সৃষ্টি করতে পারে।

তাহলে ডঃ ডেভিস তোমাদের পাওয়ার হাউসের অ্যাকসিডেন্ট তোমার চোখ খুলে দিয়েছিল?

তা বলতে পারেন ডঃ ওকস। আমি ভাইরাস···।

তাহলে তুমি সেই ভাইরাস পেয়েছ? ভাইরাসের আক্রমণে যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী হয় তেমনি তোমার আবিষ্কৃত ভাইরাস প্রয়োগ করে আমরা বিটলদের ধ্বংস করতে পারব। গ্রেট গড!

জন ডেভিস চেয়ারে বসে তার এ্যাটাচি কেস খুলে দুটো গ্লাস জার বার করল। একটা জারে কয়েকটি জীবন্ত বিটল ও কয়েকটুকরো মাংস রয়েছে এবং অপর জারটিতে অনেকগুলি মৃত বিটল রয়েছে। এদের ওপর জন ডেভিস তার আবিষ্কৃত ভাইরাস প্রয়োগ করেছিল।

একটা জার হাতে তুলে নিয়ে ডঃ ওয়ারেন ওকস হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল, পাগলের মতো।

জন ডেভিসের আবিষ্কারের একটা রিপোর্ট ডঃ ওকস অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে দিল। কেমব্রিজেও সে তার সহকারীদের বলল। দু'দেশের

বিজ্ঞানীরা প্রথমে বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা বললেন, ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করতে গেলে এবং সাফল্য লাভ করতে হলে দীর্ঘ সময় লাগে। এত দ্রুত ফল পাওয়া যায় না।

ডঃ ওকস তখন বলল, ঠিক আছে, আপনাদের আপাততঃ কিছু বিশ্বাস করতে হবে না। আমি আপনাদের চোখের সামনে সেই মারাত্মক ভাইরাস বার করে এবং পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি সেই ভাইরাস প্রয়োগ করে বিট্‌ল্‌দের পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়ব।

কর্নেল রবার্ট কাওয়েল সেখানে হাজির ছিল। সে বলল, তাহলে তো গ্যালন গ্যালন ভাইরাস লাগবে আর সেই ভাইরাস তৈরি করতে টন টন বিট্‌ল্‌ লাগবে?

না কর্নেল, তা লাগবে না কারণ ভাইরাস এত ক্ষুদ্র যে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া চোখে দেখা যায় না। ওরা বিট্‌ল্‌দের চেয়েও অনেক বেশি দ্রুত হারে নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে পারে এবং খুব সামান্য ভাইরাস মড়ক সৃষ্টি করতে পারে। একজন মাত্র মানুষকে ভাইরাস আক্রমণ করলে সেই ভাইরাসজনিত রোগ যথা ইনফ্লুয়েঞ্জা, চিকেন পক্স অতি দ্রুত সারা ইংলণ্ড ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আপনি নিশ্চিন্ত তবে যে পর্যন্ত না আমরা ভাইরাস প্রয়োগ করতে পারছি সে পর্যন্ত আপনি আপনার যন্ত্রপাতি, কপ্‌টার ও ইনসেকটিসাইড নিয়ে তৈরি থাকবেন।

ওকসের ল্যাবরেটরিতে যে কতকগুলি জীবন্ত বিট্‌ল্‌ ছিল তা থেকে কয়েকটা নিয়ে তাদের সজি খাইয়ে রোগাক্রান্ত করে মেরে ফেলা হল তারপর সেই মৃতদেহ থেকে কি সব রসায়ন প্রয়োগ করে ওকস ভাইরাস নিষ্কাসিত করে কতকগুলি জীবন্ত বিট্‌ল্‌ মেরে দেখিয়ে দিল।

পরীক্ষা সফল। অতএব যত বিট্‌ল্‌ ছিল, বংশবৃদ্ধি করিয়ে এবং তাদের মেরে ভাইরাস সংগ্রহ করা হল। হাতে সময় নেই। ওদের ঝাঁক আবার দেখা গেছে, লণ্ডন থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল উত্তরে।

তখনি জরুরী মিটি ডাকা হল। সেই মিটিং-এ প্রাইম মিনিস্টার মিঃ হার্বার্ট স্মিথকেও আসতে বলা হল।

প্রাইম মিনিস্টারকে বিট্‌ল্-ঘাতী ভাইরাসের কাহিনী বলে তাঁর সঙ্গে জন ডেভিসের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।

ডঃ ওকস বললেন, আমরা ঠিক করেছি এবার যেখানে বিটল দেখা যাবে তার কাছেই আমরা ভাইরাস মাখিয়ে কয়েকটা কাটা পশুর দেহ ও রক্ত লাগা মাংসর টুকরো ফেলে রাখব। ভাইরাস বিট্‌ল্‌দের দেহে প্রবেশ করে ওদের মধ্যে মহামারী সৃষ্টি করবে।

প্রাইম মিনিস্টার তাঁর সম্মতি দিলেন।

ডঃ ওয়ারেন ওকস এইবার নিয়ে চিফ ইনস্পেক্টর কেলিকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি নিশ্চিত তো? শয়তানগুলোকে আর কাল থেকে দেখা যায় নি?

বলেছি তো ডক্টর যে তাদের আর দেখা যায় নি, যদি কিছু নতুন খবর হয় তাহলে আমি তা সঙ্গে সঙ্গে জনিয়ে দোব।

ওকস বললেন, শয়তানগুলোকে কাল রাত্রি ন'টার সময় দেখা গিয়েছিল তারপর তারা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। একটা বড় বনের ধারে একপাল গরুকে আক্রমণ করেছিল। আমার মনে হচ্ছে শয়তান-গুলো এখন বনের মধ্যে রয়েছে, সন্ধ্যার মুখে আহারের সন্ধানে বেরিয়ে আসবে।

কেলি বলল, তাহলে তো আমরা এখনও চার পাঁচঘণ্টা সময় পাব।

একটা গাড়িতে ডঃ ওকস, কেলি এবং মিস ডায়না শিয়ারার লণ্ডন থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে শ্যাফরন ওয়ালডেনের দিকে যাচ্ছিল যেখানে বিট্‌ল্‌দের শেষ দেখা গেছে। দিনটা বেশ ভাল। শরতের শেষ। রোদ উঠেছে। আকাশে মেঘ নেই। সারাদিন রোদ থাকবে আশা করা যায়।

যে বনে বিট্‌ল্‌গুলো দেখা গেছে সেই বনের কাছে একটা মাঠ

আছে। মাঠটায় লাখ দশ বিটল বসতে পারে। রক্ত মাখা কাটা মাংস সেই মাঠে ফেলে দেওয়া হবে। মাংসর টুকরো ফেলবার আগে সেগুলিতে ভাইরাস প্রয়োগ করা হবে যাতে সেই ভাইরাস বিট্‌ল্‌দের মধ্যে মড়ক সৃষ্টি করতে পারে।

এছাড়া কর্নেল কাওয়েলও তাঁর হেলিকপটার, বিষাক্ত কীটনাশক এবং এবার আগুনে ইনসেনডিয়ারি বোমা নয়, ফ্লেম থ্রোয়ার দ্বারা অগ্নি-শিখা নিক্ষেপ করে বিট্‌ল্‌দের মারা হবে।

বিট্‌স্‌রা মাংসখণ্ডগুলির ওপর বসবার কিছুক্ষণ পরে কর্নেল কাওয়েল তাঁর অপারেশন আরম্ভ করবেন। এবার শুধু স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকার বিট্‌ল্‌ই মরবে। যদি কিছু বিট্‌ল্‌ পালাতেও পারে তাহলেও তাদের নিস্তার নেই। তাদের মধ্যে মড়ক লেগে যাবে এবং এই মড়ক ক্রমশ সমস্ত বিটলদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

প্রাচীন শহর শ্যাফরন ওয়ালডেন থেকে অধিবাসীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাইম মিনিস্টারই তার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সব খবর রাখছেন।

ইনস্পেক্টর কেলি জিজ্ঞাসা করলেন, ডঃ ওকস এই ভাইরাস মড়কের ফলাফল কবে জানা যাবে?

ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যে সব বিট্‌ল্‌রা এখন পালাবে তারা তো একটা নির্দিষ্ট দিন পরে ডিম পাড়বে তারপর তো সামনে শীতকাল। শীতকালে আবার বিট্‌ল্‌দের দেখা যাবে। বসন্তে যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে তখন বোঝা যাবে। এমনও হতে পারে ডিম ফুটে আর বাচ্চা বেরলোই না বা যে সব বাচ্চা বেরোল সেগুলো রুগ্ন হল।

তাহলে ধরুন মোটামুটি ছ'মাস পরে, কেলি বলল।

হ্যাঁ, তবে কেলি আমাদেব আজকের এই এক্সপেরিমেণ্ট কেমব্রিজ, ডারবি এবং ম্যাঞ্চেস্টারে রিপিট করতে হবে এবং ইতিমধ্যে আরও কোথাও বিট্‌ল্‌ যদি দেখা যায় সেখানেও। ইতিমধ্যে আমরা আরও ভাইরাস তৈরি করব।

দিকে। গোলমালে সে কারও কোনো কথা শুনতে পাচ্ছিল না। ডায়না হতভম্ব। ওকসকে আটকাবার মতো কাছে তখন কেউ ছিল না।

ওকস ছুটতে ছুটতে রাস্তা থেকে পাশের খানায় গড়িয়ে পড়ে গেল। পড়বার সময় কাঁটা গাছ ও পাথরে লেগে তার দু'হাত ছড়ে গেল। রক্ত বেরিয়ে পড়ল। ঝাঁকে ঝাঁকে বিট্‌ল্ এসে তাকে ছেঁকে ধরল। অনেক বিট্‌ল্ তার পোশাকের ভেতরে ঢুকে পড়ল। ওকস গড়াগড়ি খেতে লাগল ভাবল যদি পোকাগুলো পিসে মরে যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ সে গড়াগড়িও দিতে পারল না। নিস্তেজ হয়ে গেল।

ওদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিট্‌ল্ এসে মাঠে মাংস খণ্ডগুলোর ওপর বসে পড়েছে। যখন ঝাঁক আসা বন্ধ হয়ে গেল তখন কর্নেল কাওয়েল অপারেশন আরম্ভ করলেন। প্রথমে ফ্লেম থ্রোয়ার থেকে অগ্নি বর্ষিত হল তারপর বিষাক্ত কীটনাশক।

চিফ ইনস্পেক্টর ম্যালেট যখন ডঃ ওকসের দেহে কীটনাশক ছিটিয়ে দিলেন তখন ওকস মারা গেছে।

ডায়না শিয়ারার তখনও স্থাণুর মতো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেলি ডঃ ওকসের পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে এনে ডায়নার হাতে দিয়ে বলল, প্রফেসর গর্ডন হারভেলের এই চিঠিখানা ওর পকেটে ছিল। কেলির আর কিছু বলার ছিল না।

ডায়না চিঠি হাতে ধরেই রেখেছে, পড়ছে না দেখে চিফ ইনস্পেক্টর কেলি নিজেই পড়তে লাগল। প্রফেসর হারভেল লিখেছেন :

ডিয়ার ওকস,

আশা করি এতদিনে তুমি ভাইরাস ওষুধ তৈরি করেছ। কিন্তু তুমি জান নিশ্চয় যে এই ওষুধ সম্পূর্ণ ভাবে শুদ্ধ না হলে বিপদ ঘটতে পারে। আমরা যা তৈরি করতে পেরেছি তা ৯৯·৯৯ পারসেন্ট শুদ্ধ কিন্তু ০·১ পারসেন্ট শুদ্ধ নয়। তার মানে ঐ অতি সামান্য পরিমাণ ভাইরাস প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। তখন সর্বনাশ হয়ে যাবে। শুদ্ধ ওষুধ তৈরি করতে হলে দীর্ঘ সময় লাগে এ তোমার জানা আছে।

আমি প্রস্তাব করছি তুমি আপাততঃ তোমার ভাইরাস পরীক্ষা বন্ধ করে দাও।

আমাদের ল্যাবরেটরিতে দু'জন বিজ্ঞানী এক আশ্চর্য রসায়ন আবিষ্কার করেছেন। রসায়নটির রঙ রক্তের মতো, গন্ধ মাংসের, কিন্তু ভীষণ চটচটে।

আমরা ঐ রসায়নটি পরীক্ষা করেছি। খোলা জায়গায় একটি ট্রে-তে আমরা ঐ রসায়ন রেখে দিয়েছি এবং সতর্কতার সঙ্গে জীবন্ত ডেভিলস কোচ-হর্স ও টাইগার বিট্‌ল্ ছেড়ে দিতেই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে বিট্‌ল্‌রা ঐ ট্রে-এর ওপর বসেছিল, আর উঠতে পারে নি। আমার মনে হচ্ছে বিট্‌ল্‌দের ধ্বংস করবার পক্ষে এই রসায়ন কার্যকরী হবে।

তবে আমরা এই রসায়নটি অল্প পরিমাণে তৈরি করেছি। ব্যাপক ব্যবহারের জন্যে কারখানায় তৈরি করতে হবে। চিঠির উত্তর পেলে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব।

এই চিঠির একখানি নকল আমি ওয়াশিংটনে ডঃ বেসিল বেনেটকে পাঠিয়ে দিলুম।

তোমাদের

গর্ডন হারভেল।